নেতাজী
সুভাষচন্দ্র

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

অমর-প্রতিভা-সিরিজ ৭

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ রাহা

উপহার

উৎসর্গ

আজাদ হিন্দ ফৌজের
স্বর্গত ও জীবিত বীরবৃন্দের
উদ্দেশে —

গ্রন্থকার

অমর-প্রতিভা-সিরিজ

রূপায়িত করেছেন, চিত্রশিল্পী—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

পরিচালনা—

শ্রীশরৎচন্দ্র পাল

('কমলিনী-সাহিত্য-মন্দির' প্রতিষ্ঠাতা)
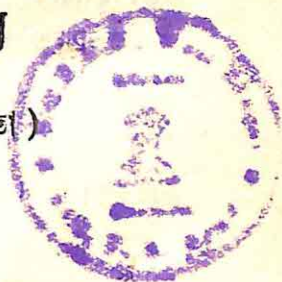
শরৎ সাহিত্য ভবন

পরাজয়কে কোনদিন পরাজয় ব'লে স্বীকার করেন নি সুভাষচন্দ্র। কবিগুরুর ভাষায়—হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের উপর চ'ড়েই চিরদিন পথ চ'লেছেন তিনি। অদম্য আশাবাদ, দুরন্ত বিজিগীষা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যকে আপন ক'রে নেবার প্রয়োজন আজ বাঙ্গালীর সব চাইতে বেশী।

অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ—এই জিনিষটি কোনদিন সহ্য ক'রতে পারেন নি সুভাষচন্দ্র। তাই, মিত্রেরাও ক্রমশঃ ত্যাগ ক'রেছেন তাঁকে। না ক'রে উপায় ছিল না তাঁদের। দেশপ্রেম যে সর্বব্যাপী, সর্বগ্রাসী, সর্বাত্মক জ্যোতি-রূপ নিয়ে সপ্রকাশ হ'য়েছিল সুভাষচন্দ্রের ভিতরে, তার সান্নিধ্য সহ্য করা ক্ষীণদৃষ্টি, দীনসত্ত্ব ব্যক্তিগণের পক্ষে সম্ভব ছিলনা।

সুভাষচন্দ্র আজ অন্তর্হিত। কিন্তু তাঁর তপোলব্ধ মহামন্ত্র "দিল্লী চলো" এখনো ধ্বনিত, প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে তাঁর দেশবাসীর অন্তরে। তরুণ ভারতের মন্ত্রগুরু নেতাজী সুভাষ। ভারতের ইতিহাসে তিনি অন্যতম অবিস্মরণীয় পুরুষ।

—গ্রন্থকার

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

এক

বাল্য ও শিক্ষাজীবন

কটকের সরকারী উকীল ছিলেন জানকীনাথ বসু, ইংরেজ-সরকার তাঁর যোগ্যতার পুরস্কার দিয়েছিলেন রায়বাহাদুর উপাধি, এবং ভগবান তাঁর মনুষ্যত্বের পুরস্কার দিয়েছিলেন এক পুত্ররত্ন, যাঁর জীবনের সাধনাই ছিল ঐ ইংরেজ-সরকারকে ভারত থেকে দূর ক'রে দেওয়া। এই পুত্রই সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্রেরা আট ভাই। সবাইকেই উচ্চশিক্ষা দিয়েছিলেন জানকীনাথ। বাল্যে কটকের সাহেবী-স্কুলে প'ড়তেন তাঁরা, শিক্ষা শেষ ক'রবার জন্য প্রায় সবাইকেই বিলাত পাঠানো হ'য়েছিল। জ্যেষ্ঠপুত্র সতীশচন্দ্র ও মধ্যম শরৎচন্দ্র ব্যারিষ্টার হ'য়ে আসেন। সুনীলচন্দ্র হন ডাক্তার, তারপর সুভাষচন্দ্র

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

সিভিল সার্ভিস পাশ করেন, কিন্তু ইংরেজের চাকরি নেবার মত প্রবৃত্তি ছিল না তাঁর। সে কথা পরে ব'লছি।

বাংলা ১৩০৩ সালের ১১ই মাঘ (ইংরেজী ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী) শনিবার বেলা ১২৷১৫ মিনিটের (দং১৩৷৩৭৷৩০) সময় সুভাষচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেন কটকে, পিতৃগৃহে। উড়িষ্যাদেশেই তাঁর বাল্যকাল কেটে যায়। তারপরই আসেন ক'লকেতা সহরে এলগিন রোডের বাড়ীতে, যা জানকীনাথ পুত্রদের শিক্ষা ও কর্মজীবনে বসবাসের জন্যই তৈরী ক'রেছিলেন। পৈত্রিক আদি-বাসস্থান ২৪ পরগণা জিলার কোদালিয়া গ্রামে সুভাষ কখনো গেছেন কি না সন্দেহ।

প্রথমেই সুভাষকে প'ড়তে দেওয়া হয় সাহেবী-স্কুলে, তারপর তিনি কটকের কলেজিয়েট স্কুলে প্রবেশ করেন ১৯০৯ সালে। সঙ্গে-সঙ্গেই অতি-মেধাবী ছাত্র ব'লে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু অধ্যয়নের চাইতে ধর্মজীবনের দিকে সুভাষের আকর্ষণ ছিল বেশী। তাঁর মাতা ছিলেন অতি পুণ্যশীলা মহিলা। তাঁর সঙ্গে বালক সুভাষের আলাপ-আলোচনা চ'লত ধর্মবিষয়ে। এমন কি, সুকুমার বয়সেই তিনি ধ্যানে ব'সবার অভ্যাস করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃত প'ড়তে-প'ড়তে তিনি তন্ময় হ'য়ে যেতেন। স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে মানব-সেবায় আত্মোৎসর্গ ক'রবার কথা চিন্তা ক'রতেন বালক সুভাষচন্দ্র। পীড়িতের শুশ্রূষা, দুঃস্থের দুঃখমোচন, এ ছিল তাঁর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ।

স্কুলের পাঠ্যবিষয়ে তাঁর মনোযোগ বেশী ছিল না, তবু অসাধারণ মেধার বলে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান দখল করেন ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে। তারপরই তাঁকে ক'লকেতায় পাঠানো হয় কলেজে প'ড়বার জন্য। তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আই-এ পড়া সুরু করেন সংস্কৃত, গণিত আর লজিক নিয়ে।

এই সময়ে যাঁদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়, তাঁরা পরবর্ত্তী-জীবনে অনেকেই বাংলার খ্যাতনামা সুসন্তান ব'লে গণ্য হ'য়েছেন। এঁদের ভিতর ডাক্তার প্রফুল্ল ঘোষ, ডাক্তার সুরেশ ব্যানার্জী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। এঁরা তখন সবাই সঙ্কল্প ক'রেছিলেন—চিরকুমার থেকে ধর্মজীবন যাপন ক'রবেন ও দেশের কাজ ক'রে যাবেন। সুভাষচন্দ্র এঁদের সঙ্গে এক হ'য়ে মিশে যেতে পারেন নি এইজন্য যে, তাঁর ধর্মজীবন যাপনের ধারণা ছিল অন্যরকম। গৃহে ব'সে ধর্ম হয়, এ তিনি বিশ্বাস ক'রতেন না। রীতিমত সন্ন্যাস অবলম্বন ক'রবারই ইচ্ছা ছিল তাঁর। অবশেষে ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে তিনি এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গৃহ ত্যাগ ক'রে চ'লে গেলেন। প'ড়ে রইল কলেজ, প'ড়ে রইল পড়াশুনা। তিনি সোজা গিয়ে উঠলেন হরিদ্বারে।

হরিদ্বারে সাধু ও সন্ন্যাসীর সংখ্যা ক'রে ওঠা যায় না। সুভাষচন্দ্রের বড় আশা ছিল এঁদের ভিতর একজন সত্যিকার গুরু খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হ'লো না। মিলল না গুরু। কি ক'রে মিলবে? হিমালয়ের গুহায় যোগস্থ

হ'য়ে ব'সেথাকবার জন্য সুভাষচন্দ্রকে ভগবান ভারতে পাঠান নি। কোন গুরুই তাঁকে দীক্ষা দিতে রাজী হ'লেন না। তিনি মথুরা, বৃন্দাবন, কাশী, গয়া সর্বত্রই পর্যাটন ক'রলেন—তীর্থ না হ'লেও দিল্লী, আগ্রা বাদ গেল না—কিন্তু গুরু তাঁর জুটল না। অনেক যোগী সন্নাসীর সঙ্গে আলাপ অবশ্য হ'য়েছিল। বৃন্দাবনে একজনের কাছে বৈষ্ণব-শাস্ত্র অধ্যয়নও ক'রেছিলেন কিছুদিন। সেই সময় রামকৃষ্ণদাস নামক জনৈক সাধু তাঁকে বলেন, "তোমার জন্য ভক্তিমার্গ নয় বাবা, তুমি কাশীধামে গিয়ে জ্ঞানমার্গ চর্চা কর।" তদনুসারে কাশীতে এসে তিনি রামকৃষ্ণ-মিশনের আশ্রমে প্রভু রাখাল মহারাজের (রামকৃষ্ণশিষ্য ব্রহ্মানন্দ স্বামী) কাছে বাস করেন। পরে তাঁরই উপদেশে তিনি বাড়ী ফিরে আসেন।

এতদিন বাড়ীতে চ'লেছে হুলস্থুল। চারিদিকে খোঁজ চ'লেছে, বেলুড় থেকে হরিদ্বার পর্যন্ত চিঠি আর 'তার' আনাগোনা ক'রেছে অগুন্তি। সুভাষের মামা বৈদ্যনাথ দেওঘরে গিয়ে পাহাড়ে-পাহাড়ে খোঁজ নিচ্ছেন। সুভাষ যখন ফিরে এলেন, সবাই হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। জানকীনাথ তিরস্কারের পরিবর্তে তত্ত্ব জিজ্ঞাসা সুরু ক'রলেন। পিতাপুত্রে সন্ন্যাসজীবনের উপযোগিতা নিয়ে আলোচনা হ'ল। পিতার মনে হ'ল পুত্র হয়ত আবারও যাবে। মাতা শুনিয়ে রাখলেন—"যাস যদি, আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। আমি ম'রে যাব।" সেদিন সে-কথা শুনে নিয়তি অলক্ষ্যে ব'সে হেসেছিলেন বোধ হয়।...সন্ন্যাসী না হ'য়েও সুভাষ একদিন

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে প'ড়লেন, এবং মা ম'রবার সময় সুভাষকে দেখতে পেলেন না।...

আপাততঃ কিন্তু সুভাষ কলেজে ফিরে গেলেন। আই-এ পরীক্ষার বেশী দিন বাকি নেই তখন। ঐ সময়ের ভিতরই সামান্য কিছু পড়াশুনা ক'রে পরীক্ষাটা দিয়ে ফেললেন। ফল বেরুলে দেখা গেল, প্রথম শ্রেণীর উপরের দিকেই উত্তীর্ণ হ'য়েছেন সুভাষ।

অতঃপর তিনি প্রেসিডেন্সীতেই বি-এ প'ড়তে সুরু ক'রলেন দর্শনে অনার নিয়ে। এই সময়ে এক অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘ'টে গেল। এক দাম্ভিক ইংরেজ এসেছিল প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক হ'য়ে। সে খামকাই একজন ছাত্রকে অপমান ক'রে ব'সল। ছাত্র-সমাজ থেকে প্রতিবাদ হ'ল। সুভাষচন্দ্র নিজের চরিত্রবলে তখন ছাত্রনেতা প্রেসিডেন্সী কলেজে। তিনি দাম্ভিক শ্বেত-হস্তীকে রীতিমত প্রহার দিয়ে ছেড়ে দিলেন কলেজের ভিতরই। সাহেব-পুঙ্গবের নাম ছিল, "ওটেন।" সেই হ'তে ছাত্র-সমাজে একটি নতুন কথার প্রচলন হ'ল—সেটি হ'ল "ওটেনাইজ" অর্থাৎ প্রহার করা। জানি না এ-যুগের ছাত্ররা ঐ শব্দটির সঙ্গে পরিচিত কি না।

ওটেনকে ওটেনাইজ করায় কলেজ কর্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রকে ক'রলেন "রাষ্টিকেট্" অর্থাৎ কলেজ থেকে নিষ্কাশন। এবং গবর্ণমেণ্ট তাঁকে ক'রলেন স্বগৃহে অন্তরীণ, কটকে। প্রশ্ন হ'তে

পারে—কলেজের ছাত্রকে কলেজই যখন সাজা দিয়েছে, তখন আবার গবর্ণমেণ্ট এ-ব্যাপারে মাথা ঘামাতে গেলেন কেন। না ঘামিয়ে কি পারেন ? ওটেন যে লাটসাহেবের জ্ঞাতি ! ওটেনের অপমান ভারত-সচিবের পর্য্যন্ত গায়ে গিয়ে বাজল ! জবরদস্ত ইংরেজ-সরকার সুভাষচন্দ্রকে সেই থেকেই দুর্বিনীত ব'লে গণ্য ক'রে রাখল। হয়ত রাজকীয় গুপ্তচর বিভাগের খাতায় সেই দিনই তাঁর নামে একটি হিসাব খুলে প্রথম কালো দাগ আঁকা হ'ল—শ্বেতকায়বিদ্বেষী ব'লে।

যা হ'ক, কটকের বাড়ীতে আবদ্ধ হ'য়ে ব'সে রইলেন সুভাষচন্দ্র দু'টি বৎসর। ধর্মগ্রন্থ পাঠ আর ধর্মালোচনাই ছিল এ-সময়ে তাঁর কাজ। জানকীনাথ কিন্তু হাল ছেড়ে দিলেন না। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার স্যার আশুতোষকে এসে ধ'রলেন সুভাষের একটা উপায় ক'রবার জন্য। দীর্ঘদিন চেষ্টা ক'রে স্যার আশুতোষ সুভাষের উপর থেকে রাজদণ্ড ও বিশ্ববিদ্যালয়ের দণ্ড দুই-ই অপসারিত ক'রতে সক্ষম হ'লেন। কিন্তু প্রেসিডেন্সী কলেজ আর তাঁকে নিলে না। তিনি স্কটিশচার্চ কলেজে আবার বি-এ প'ড়তে সুরু ক'রলেন দর্শনে অনার নিয়ে। যথাকালে অনারে প্রথম বিভাগের দ্বিতীয় স্থান অধিকার ক'রে তিনি বি-এ পাশ ক'রলেন।

বি-এ প'ড়বার সময়েই তিনি ইউনিভার্সিটী কোর বা সৈন্যদলে যোগদান করেন। সৈনিকজীবন তাঁর অতিশয় প্রিয় ছিল। বেলঘরিয়ায় তাঁদের যে শিবির প'ড়েছিল, তার সম্বন্ধে তিনি

শ্রীহেমন্তকুমার সরকারকে পত্রে লিখেছিলেন—"যখন ঝড় বৃষ্টিতে তাঁবু সব ভেসে গিয়েছিল, পরদিন প্রাতঃকাল থেকে বেলা ৪৷টা পর্য্যন্ত Continual firing চলেছিল, তখন কতকটা field service-এর মতই বোধ হ'য়েছিল। তারপর পায়খানা প্রস্তুত করা, দূরবর্ত্তী গ্রাম থেকে পানীয় আহরণ করা, রাত্রিতে 'সান্ত্রী' পাহারা দেওয়া, এবং সর্বোপরি night operation গুলি জীবনটাকে মধুর ক'রে তুলেছিল।...শেষ কয়দিন Camp life এত pleasant বোধ হ'য়েছিল যে, Camp ছাড়তে অল্পাধিক কষ্ট সকলেরই হ'য়েছিল।"

বি-এ পাশ ক'রবার পরে Experimental Psychologyতে এম-এ পড়বার জন্য সুভাষচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। কিন্তু মাস-দুইয়ের বেশী প'ড়তে পেলেন না তিনি। এবারে তাঁর বাবাই বাদ সা'ধলেন। তিনি সুভাষকে দিলেন, বিলাত পাঠিয়ে। তাঁর উদ্দেশ্য, সুভাষ I. C. S. পাশ ক'রে আসুক। কিন্তু সুভাষের আন্তরিক বিতৃষ্ণা ছিল সিভিল সার্ভিসের চাকরির উপর। ইংরেজ-সরকারের চাপরাশ এঁটে স্বদেশবাসীর উপরে চোখ রাঙ্গানো—এ-কল্পনাই ক'রতে পারতেন না সুভাষ। কিন্তু বিলেত যাওয়ার ঝোঁক তাঁর ছিল প্রচণ্ড। তাঁর উদ্দেশ্য কেম্ব্রিজ থেকে ডিগ্রি নিয়ে দেশে এসে অধ্যাপনা করা। কিন্তু কেম্ব্রিজে প'ড়বার জন্য বাবা বিলেত পাঠাতে নারাজ। অবশেষে স্থির হ'ল, সুভাষ গিয়ে I. C. S. পরীক্ষাই দেবেন। পরীক্ষার অল্পদিনই বাকি

আছে, যদিস্যাৎ এই অল্পদিনের ভিতর সুভাষ তৈরী হ'য়ে উঠতে না পারেন, অর্থাৎ I. C. S.-এ ফেল করেন, তবে তখন তিনি কেম্ব্রিজে প'ড়বার অনুমতি পাবেন। সুভাষ কিন্তু বিলাত পৌঁছেই হেমন্ত সরকার মহাশয়কে লেখেন—"আমার মতলব আগামী বৎসরে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেওয়া এবং পাশ করি বা ফেল করি, ১৯২১ সালের মে মাসে Moral Science Tripos-এর পরীক্ষা দেওয়া।" তদনুযায়ী ১৯২০ সালে সুভাষচন্দ্র আই, সি, এস্ পরীক্ষা দিলেন এবং পাশ না ক'রবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করা সত্ত্বেও তিনি বেশ উপরের দিকেই পাশ ক'রে ব'সলেন (৪র্থ স্থান অধিকার ক'রে)। নিয়তির এই পরিহাসে তিনি বিশেষ বিরক্ত হন এবং বন্ধুকে পত্র লেখেন—"পাশ ক'রে ফেলেছি, এখন উপায় ?"

উপায় হ'ল বই কি। গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে I. C. S.-এর নিয়োগপত্র পাওয়া মাত্রই তিনি পদত্যাগ ক'রে চিঠি দিলেন ভারতসচিবকে। বেচারী ভারতসচিব বুঝতেই পা'রলেন না যে, এ আবার কোন্ ধাতুর আদমি একজন। I. C. S.-এর ইন্দ্রপদ পেয়েও যে-ভারতবাসী প্রত্যাখ্যান করে, সে নিশ্চয় বিপজ্জনক লোক। এই ঘটনায় বোধহয় ভারতীয় সি, আই, ডি'র খাতায় সুভাষচন্দ্রের নামে আর এক নম্বর কালো দাগ প'ড়ল।

সুভাষচন্দ্র কিন্তু চাকরি ছেড়েই গম্ভীরভাবে কেম্ব্রিজে পড়াশুনা ক'রতে লাগলেন এবং ১৯২১ সালে সেখানকার দর্শনশাস্ত্রে পাশ

ক'রলেন সসম্মানে। এখন তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা বেছে নেবার সময় এল। তিনি মহাত্মা গান্ধীর কাছে পত্র দিলেন। তিনি দেশের কাজে আত্মনিয়োগ ক'রতে চান—এই ছিল তাঁর বক্তব্য। মহাত্মা সুভাষচন্দ্রকে উপদেশ দিলেন, বাংলায় এসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের উপদেশমত চ'লতে। দেশবন্ধুর কাছে লিখতেই তিনি সুভাষকে দিতে চাইলেন জাতীয় বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষপদ এবং একখানা দৈনিক-সংবাদপত্রের পরিচালনা ভার।

এর অল্পদিন পূর্বে মহাত্মা গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রবর্তিত ক'রেছেন। তাঁর আহ্বানে বিশ্ববিদ্যালয় খালি ক'রে ছাত্রদল বেরিয়ে এসেছে। এদের শিক্ষার একটা ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। সেই উদ্দেশ্যেই দেশবন্ধু জাতীয় বিদ্যাপীঠ নাম দিয়ে এক কলেজ খোলেন ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ফরবেস্ ম্যান্সনে। অধ্যাপক জিতেন ব্যানার্জী এই বিদ্যাপীঠের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। যে-কারণেই হ'ক, তিনি বিদ্যাপীঠের সুষ্ঠু পরিচালনার দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নি কোনদিনই। ফলে, বিদ্যাপীঠের কাজে দারুণ বিশৃঙ্খলা ঘ'টতে লাগল। এই সময়ে সুভাষচন্দ্র বিলাত থেকে ফিরে এলেন। দেশবন্ধু তখনই বিদ্যাপীঠের অধ্যক্ষপদে নিয়োগ ক'রলেন তাঁকে। অধ্যক্ষতা ছাড়াও ইংরেজী, ভূগোল ও দর্শন পড়া'তে হবে তাঁকে। এবং সঙ্গে-সঙ্গে চালিয়ে যেতে হবে কংগ্রেসের প্রচার-সচিবের কাজ।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

দুই

কর্মজীবনের প্রারম্ভ

জিতেন ব্যানার্জী মহাশয়ের অধ্যক্ষতার শেষ দিকে বিদ্যাপীঠের এমন কলঙ্ক ছড়িয়ে প'ড়েছিল ছাত্রদের মুখে-মুখে যে, সুভাষচন্দ্র যেদিন জোড়াসাঁকোতে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রতে গেলেন বিদ্যাপীঠের ভার নেবার পরে,—সেদিন বিশ্বকবি তাঁকে জিজ্ঞাসা ক'রেছিলেন—"কী সুভাষ, তোমরা কি কলেজের নাম বিদ্যাপীঠ দিয়েছ—বিদ্যা ওখান থেকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রেছেন ব'লে?" সুভাষচন্দ্রকে তিনি আগে থেকে জা'নতেন। ওটেন-সাহেবকে প্রহার ক'রে সুভাষচন্দ্র যখন কলেজ থেকে বিতাড়িত হন, তখন রবীন্দ্রনাথ সবুজপত্রে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন ও-সম্বন্ধে। তা প'ড়ে দেশের তরুণেরা সেদিন সুভাষচন্দ্রের অনুরাগী হ'য়ে উঠেছিল। এমনও কেউ-কেউ ব'লেছেন যে, সুভাষচন্দ্র আই, সি, এস চাকরি গ্রহণে অস্বীকার ক'রেছিলেন রবীন্দ্রনাথেরই প্রেরণায়। পরবর্তী জীবনে সুভাষচন্দ্র বিশ্বকবির কাছ থেকে যে উত্তরোত্তর গভীরতর স্নেহ লাভ ক'রে ধন্য হ'য়েছিলেন, তার পরিচয় গাঁথা র'য়েছে "মহাজাতি-সদনের" ইট-কাঠে, এবং কবির 'দেশ-নায়ক' নামক প্রবন্ধে।

বিদ্যাপীঠের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য উঠে প'ড়ে লা'গলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু তাঁর ষোল-আনা মনোযোগ বেশী দিন ধ'রে পাওয়া বিদ্যাপীঠের ভাগ্যে ছিল না। দেশে ঘটনা ঘ'টে যাচ্ছে বিদ্যুতের বেগে,

ধরা-বাঁধা কার্য্যক্রম সে বিদ্যুতের সংঘাতে চূর্ণ হ'য়ে যায়। ১৯২১ সালের নভেম্বর মাসে ইংলণ্ডের যুবরাজ (Prince of wales) এডোয়ার্ড ভারতবর্ষে এলেন। এদেশে ইংরেজের প্রতিপত্তি লোপ পেতে ব'সেছে। তারই কথঞ্চিৎ পুনরুদ্ধারের জন্য ব্রিটিশ-সরকার যুবরাজকে পাঠালেন ভারতে। ভারতবাসী চিরদিনের রাজভক্ত জাতি। রাজার ছেলেকে দেখলে আনন্দে আত্মহারা হয়ে তারা দেশের দুর্দশার কথা ভুলে যাবে—এই রকম কিছু একটা আশা ক'রেছিলেন বোধ হয় লণ্ডনের মোড়লেরা। কিন্তু তাঁদের বড় আশায় ছাই প'ড়ল। যুবরাজকে সম্বর্দ্ধনা ক'রবার জন্য দেশবাসী তিলমাত্র আগ্রহ প্রকাশ ক'রল না। যুবরাজকে রীতিমত বয়কট ক'রল দেশের লোক। বোম্বাই সহরে প্রবেশ ক'রলেন রাজপুত্র—জাহাজ থেকে নেমে। সহরের রাজপথ শূন্য। মাদ্রাজে ত' সেই সময় রীতিমত হাঙ্গামাই হ'ল। ক'লকেতায় হাঙ্গামা হয় নি, কিন্তু এখানকার বয়কট হ'য়েছিল আশ্চর্য্যরকম সাফল্যমণ্ডিত। সহরের রাজপথে সেদিন গাড়ী ঘোড়া চলেনি, নিতান্ত ব্যক্তিগত প্রয়োজন ব্যতীত রাস্তাতেও বেরোয় নি কেউ। এ সমস্ত ব্যাপারটার সংগঠন ক'রেছিলেন সুভাষচন্দ্র। তিনি ছিলেন এ বয়কটের সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতার মূল কারণ। ইংরেজ-সরকার এ-ভাবে অপ্রস্তুত হবার কথা স্বপ্নেও মনে ক'রতে পারেন নি। অপ্রস্তুত হ'য়ে রোষকষায়িত নেত্রে তাঁরা দৃষ্টিপাত করলেন সুভাষচন্দ্রের উপরে। সি, আই, ডি'র খাতায় তাঁর নামে সেদিন কালো ঢেঁড়া প'ড়ল—নম্বর তিন।

এই বয়কটের উপলক্ষে কংগ্রেসের সংগঠনের কাজ অনেকখানি এগিয়ে গেল। কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়ক পদে বৃত হলেন সুভাষচন্দ্র। কিন্তু সরকার নীরবে থাকবার পাত্র নন। তাঁরা ১৯২১ সালের ডিসেম্বর মাসে এক নতুন আইন পাশ করলেন, তার নাম সংশোধিত ফৌজদারী আইন (Criminal Law Amendment Act)। এই নতুন আইন অনুসারে কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী বে-আইনী ব'লে ঘোষিত হ'ল।

কিন্তু সরকারী ঘোষণার মূল্য দেশসেবকের চোখে কতটুকু? দেশবন্ধু ব'ললেন—"স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীকে চতুর্গুণ বড় ক'রে তোল। কত লোক ওরা ধ'রবে, ধরুক।" সুভাষচন্দ্র হাজারে-হাজারে ছেলে ভর্ত্তি ক'রতে লাগলেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে। বিদ্যাপীঠের বাড়ীতে হ'তে লাগল এই কাজ। বিদ্যাপীঠের পড়াশুনা বন্ধ রইল। স্বেচ্ছাসেবকের দলে নাম লিখিয়ে ছেলেরা সঙ্গে-সঙ্গে জেলে চালান হ'তে লাগল। প্রেসিডেন্সী, আলিপুর জেলে আর স্থান নেই। স্পেশাল জেল তৈরী হ'ল দমদমে ও খিদিরপুরে। বন্যার জলে যেমন মাঠ ভেসে যায়, ছেলের দলে তেমনি জেল ভেসে গেল। তারা গবর্ণমেন্টের বে-আইনী আইন মানবে না। দেশবন্ধুর প্রেরণায়, সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে তারা জেলে এসেছে। স্বৈরাচারী সরকারের আত্মপ্রসাদের মূলে কুঠার হা'নতে এসেছে তারা। ১০ই ডিসেম্বর তারিখে পুলিশ সুভাষচন্দ্রকে গ্রেপ্তার ক'রল। সঙ্গে-সঙ্গে দেশবন্ধুও ধৃত হ'লেন। তাঁর পুত্র

ও পত্নী আগেই গিয়েছেন জেলে। মৌলানা আবুল কালাম আজাদও সেদিন ছিলেন দেশবন্ধুর কারাসঙ্গী।

সুভাষচন্দ্র কারাপ্রাচীরের অন্তরালে অন্তর্হিত হওয়ার ফলে বিদ্যাপীঠ একেবারেই বন্ধ হ'ল। ১৯২২ সালে জেল থেকে বেরিয়ে তিনি রায়বাগান ষ্ট্রীটের একটা বাড়ীতে নতুন ক'রে বিদ্যাপীঠ খুলেছিলেন. কিন্তু ও-প্রতিষ্ঠানটি আর ভালভাবে চলে নি। তার কারণ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে-সব ছাত্র বেরিয়ে এসে জাতীয় বিদ্যাপীঠে ঢুকেছিল, সুভাষচন্দ্রের কারাদণ্ডের পর তারা আবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফিরে এল। সামান্যসংখ্যক ছাত্রই বিদ্যাপীঠের নামের মোহ কাটাতে পারে নি। কিন্তু অত-কম ছেলে নিয়ে কলেজ চলে না, এবং চালাবার লোকও ছিল না। একা সুভাষচন্দ্র, তাঁর শতেক কাজ, স্থির হ'য়ে ব'সবার তাঁর সময় কোথায় ?

সুভাষচন্দ্র কারাগার থেকে বেরুবার সঙ্গে-সঙ্গেই খবর এল—উত্তরবঙ্গ ভেসে গেছে বন্যায়। লক্ষ-লক্ষ মানব গাছের ডালে আশ্রয় নিয়েছে। ঘরবাড়ী আর নেই তাদের। গবাদি পশু ম'রে গিয়েছে সব, গোলাভরা ধান যেখানে ছিল—সেখানে ঢেউ খেলে যাচ্ছে বন্যার জল। বন্যার্তের কাতর ক্রন্দন রাজধানীর লোককে সেদিন ক'রে তুললে চঞ্চল, বিচলিত। সবার অগ্রণী হ'লেন সুভাষচন্দ্র, রিলিফের সমস্ত ভার নিয়ে। দলে-দলে স্বেচ্ছাসেবক চ'লল তাঁর সঙ্গে।

সে কী দৃশ্য উত্তরবঙ্গে! চারিদিকে ধূ ধূ জলরাশি, মাঠ ঘাট

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

গ্রাম পল্লী বিল নদী সব একাকার! মাঝে-মাঝে গাছের মাথা জেগে আছে শুধু, আর নয়-ত কোন অতি-মজবুদ পাকা বাড়ীর চূড়া। সেই সব গাছের মাথায় আর বাড়ীর ছাদে আশ্রয় নিয়ে যারা প্রাণ বাঁচিয়েছে, তাদেরই কাছে পৌঁছে দিতে হবে খাদ্য ও বস্ত্র! কাজ খুব মোলায়েম নয়! স্বেচ্ছাসেবকদের নিজেদেরও আশ্রয়, নৌকাই! তাতে ক'রেই চ'লল তাঁদের সাহায্যদানের অভিযান। ক্রমে জল শুকিয়ে এল, ডাঙ্গা জাগতে লাগল, বৃক্ষারোহীরা ভূতলে অবতীর্ণ হ'য়ে পদস্থ হ'ল আবার। তখন এল তাদের গৃহনির্মাণের সমস্যা, আগামী চাষের জন্য বীজধান ও লাঙ্গলগোরু-সংস্থানের প্রশ্ন, কত কী কঠিন কাজ!

সুভাষচন্দ্র এই সময়ে যে সংগঠনী-শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা বিস্ময়কর। তিনি খাদ্য বস্ত্র যোগাবার ভারই শুধু নিয়েছিলেন—তা নয়, বহির্জগতের সঙ্গে বন্যাবিধ্বস্ত অঞ্চলের যোগাযোগ রক্ষাও তিনিই করেছিলেন। এর জন্য নিজস্ব ডাকঘর প্রতিষ্ঠাও ক'রেছিলেন তিনি। সুদূর সরকারী পোষ্ট-অফিস থেকে ডাক নিয়ে স্বেচ্ছাসেবকেরা গ্রামে-গ্রামে বা ক্যাম্পে-ক্যাম্পে বিলি ক'রে বেড়া'ত—সরকারী ডাক-হরকরার মতন। ডাক্তারখানা হাঁসপাতালের ব্যবস্থা ক'রেছিলেন তিনি। ক্যাম্পে-ক্যাম্পে প্যারেড হ'ত স্বেচ্ছাসেবকদের। প্রত্যেক বড় ও ছোট ব্যাপারে সামরিক শৃঙ্খলা রক্ষা ক'রে চ'লতে হ'ত সবাইকে।

উত্তরবঙ্গ বন্যা রিলিফের কাজ সুসম্পন্ন ক'রে সুভাষচন্দ্র ফিরে

এলেন ক'লকেতায়। রায়বাগান স্ট্রীটে বিদ্যাপীঠের কাজ দ্বিতীয় পর্য্যায়ে চ'লেছিল কিছুদিন, তা পূর্বেই ব'লেছি। এই সময়ে বিদ্যাপীঠের ছাত্রেরা সুভাষচন্দ্রকে এক অভিনন্দন প্রদান করেন।

এই সময়ে সুভাষচন্দ্র "বাংলার কথা" নামক বিলুপ্ত কাগজ-খানিকে দৈনিক পত্রিকারূপে পুনঃ প্রকাশ ক'রতে থাকেন, হরি ঘোষ স্ট্রীট থেকে। ক্ষুদ্র আয়োজন, কাগজের আকারও ক্ষুদ্র, ছাপাও বেশী হ'ত না। কিন্তু তার চাহিদা ছিল অসম্ভব। সুভাষচন্দ্র নিজে দাঁড়িয়ে কাগজ ভাগ ক'রে দিতেন ফিরিওলাদের মাঝে। তা নইলে বোধ হয় কাগজের জন্য রোজ একবার ক'রে মাথা ফাটাফাটি হ'ত। আইন-সভায় প্রবেশ করা-না-করার প্রশ্নে এই সময়ে কংগ্রেসের ভিতর একটা আত্মবিচ্ছেদ ঘটে। প্রবেশ করার পক্ষে ছিলেন চিত্তরঞ্জন, বিপক্ষে মহাত্মা গান্ধীপ্রমুখ কংগ্রেসের অন্য নেতৃবর্গ। গয়া-কংগ্রেসে চিত্তরঞ্জন পরাজিত হন এই প্রশ্ন তুলে। সেই থেকে তাঁর বিরুদ্ধবাদীরা রীতিমত নিষ্করুণ ও রূঢ় হ'য়ে উঠলেন তাঁর উপর। সবাই মিলে দেশবন্ধুকে একরকম অপাংক্তেয় ক'রে ফেললেন রাজনীতির সভায়। এমন-কি তাঁর একটা বিবৃতি পর্য্যন্ত কোন কাগজ ছাপতে চায় না। কাগজের ভিতর তাঁর পক্ষে তখন র'য়েছে একমাত্র ক্ষুদ্রকলেবর 'বাংলার কথা'—বড়'র মহলে তার প্রবেশও নেই। এই অবস্থায় প'ড়ে চিত্তরঞ্জন একটা ইংরেজী দৈনিক প্রকাশ ক'রবার জন্য অতিমাত্র উদ্‌গ্রীব হ'য়ে উঠলেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

প্রথমটা অর্থাভাবও ছিল। কিন্তু ১৯২৩ সালে মাদ্রাজ ভ্রমণে গিয়ে দেশবন্ধু প্রভূত অর্থ উপহার পান। সেই অর্থেই গোড়াপত্তন হ'ল দৈনিক 'ফরোয়ার্ডের'।

ফরোয়ার্ড কাগজ প্রথম প্রকাশিত হ'ল ১৯২৩ সালের ২৩শে অক্টোবর। প্রধান সম্পাদক দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন স্বয়ং, তাঁর সহকারী ছিলেন শ্রীমৃণালকান্তি বসু, পরিচালনার ভার দেওয়া হ'ল সুভাষচন্দ্রের উপরে। সেই সঙ্গে "বাংলার কথাও" বর্দ্ধিত আকারে প্রকাশিত হ'তে লাগল, এবং সঙ্গে-সঙ্গে 'আত্মশক্তি' নামক একখানি সাপ্তাহিকও।

ফরোয়ার্ড কাগজের বেদীমূলে নিজেকে পরিপূর্ণ রকমে উৎসর্গ ক'রে দিলেন সুভাষচন্দ্র। দিবারাত্রি কাগজের অফিসেই তাঁর কাটত। অনেক সময়ে রাত্রিবাসও ক'রতেন কাগজের অফিসে। নিকটবর্ত্তী হোটেলে যা-কিছু খাদ্য বা অখাদ্য পাওয়া যেত গভীর রাত্রে, তাই খেয়ে অফিসের টেবিলে রাত্রি যাপন (অর্থাৎ রাত্রির শেষ ২।৩ ঘণ্টা) ক'রতে কোন কষ্ট বোধ ক'রতেন না তিনি। সে-সময়ে দেশবন্ধুর নবপ্রতিষ্ঠিত স্বরাজ্য-পার্টির প্রাণস্বরূপ ছিল এই 'ফরোয়ার্ড'। এরই দৌলতে স্বরাজ্য-পার্টি আইন সভার নির্বাচনে বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন ক'রেছিল। সুভাষচন্দ্র পরিচালক ছিলেন ব'লে যে তিনি ফরোয়ার্ডে লিখতেন না, এমন যেন কেউ মনে না করেন। তাঁর কলম চ'লত খুব দ্রুত এবং ভাষা ছিল জোরালো ও তীক্ষ্ণ। তা ছাড়া, সংবাদ পরিবেশনের ব্যাপারে

তিনি অনেক নূতনত্ব আমদানী ক'রেছিলেন। একটা সংবাদের ভিতরকার প্রধান কথাটিকে প্রাধান্য দিয়ে শিরোনামায় স্থান দেওয়ার রীতি তিনিই প্রবর্ত্তন করেন। এমন ভাবে কাগজের সংবাদ ও বক্তব্য সাজানো হ'ত যে, পত্রিকাখানির মর্ম কথা প্রথম দৃষ্টিতেই পাঠকের চো'খে ধরা প'ড়ত। "The history of the Forward in its early days is the history of Subhas Chandra Bose. It was Subhas in the making.— এ-কথা লিখেছেন শ্রীশচীন দাশগুপ্ত—যিনি এই সময়ে সুভাষচন্দ্রের সহকর্মী ছিলেন ফরোয়ার্ড কাগজে।

এর কিছুদিন আগে সুভাষচন্দ্রকে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু ফরোয়ার্ড নিয়ে সুভাষ এমনি তন্ময় হ'য়ে গিয়েছিলেন যে, সম্পাদক-পদের কাজে মোটেই সময় দেওয়া সম্ভব ছিল না তাঁর পক্ষে। এই কারণে তিনি ও-কাজ ছেড়ে দেন। সম্মানের লোভে পদ আঁকড়ে থাকার পক্ষপাতী সুভাষচন্দ্র ছিলেন না।

শীঘ্রই Indian Daily News পত্রিকার ছাপাখানা কিনে নিলেন দেশবন্ধু ফরোয়ার্ডের জন্য। কিছুদিন পর একটা মামলায় প'ড়ে ফরোয়ার্ডের নাম বদলে দেওয়া হয়। তখন থেকে ঐ কাগজ Liberty নামে প্রকাশিত হ'তে থাকে। সঙ্গে-সঙ্গে বাংলার কথা'রও নাম বদলে গিয়ে হয়, বঙ্গবাণী'।

গোপীনাথ সাহা নামক এক বালক পুলিশ কমিশনার টেগার্ট

সাহেবকে মা'রতে গিয়েছিল। গুলী লাগল অন্য-এক সাহেবের গায়ে—সে মরল। বিচারে গোপীনাথের ফাঁসী হ'ল। সুভাষচন্দ্র তখন ফরোয়ার্ডের কর্মসচিব। ভোর রাত্রে তিনি জেল-গেটে গিয়েছিলেন—ফাঁসীর সময় উপস্থিত থাকবার জন্য। ফিরে আসবার পর তাঁর বিচলিত ভাব দেখে তার যে বর্ণনা দিয়েছেন কবি সাবিত্রী প্রসন্ন তাঁর "সুভাষচন্দ্র" পুস্তকে—তা এখানে উদ্ধৃত ক'রে দেবার লোভ সংবরণ ক'রতে পা'রলাম না।

"তাঁর অফিসঘরে দেওয়ালে-টাঙ্গানো একখানা ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে চেয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন আর গুণগুণ ক'রে গান গাইছেন—"তোমার পতাকা যারে দাও, তারে বহিবারে দাও শকতি।" হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে যখন চাইলেন, তখন সে মূর্ত্তি দেখে আমি চ'মকে উঠলাম। সারা মুখে কে যেন সিন্দুর ঢেলে দিয়েছে। অনেকক্ষণ ধ'রে গুমরে গুমরে কাঁদলে যেমন মুখের চেহারা হয়, ঠিক তেমনি। দু'চোখের কোণে জল।...সুভাষবাবু আবেগ-কম্পিত গম্ভীরকণ্ঠে ব'ললেন—

'গোপীনাথ সা'র ফাঁসী হ'য়ে গেল, জেলের গেট থেকেই বরাবর এখানে আসছি।'

'...সুভাষবাবুকে এমন বিচলিত, এমন ব্যথাতুর, এমন ক্লান্ত যেন আমি এর আগে কখনো দেখিনি!'

ফরোয়ার্ড ছিল সুভাষচন্দ্রের প্রাণ। কিন্তু ফরোয়ার্ডকেও একদা ত্যাগ ক'রে যেতে হ'ল তাঁকে। অন্য কর্মক্ষেত্রে তাঁর

ডাক প'ড়ল। তখন দেশবন্ধু মেয়র হ'য়েছেন কলিকাতা কর্পোরেশনে, (১৯২৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাস)। চীফ একজিকিউটিভ অফিসার পদের জন্য একজন সুযোগ্য লোক তাঁর চাই। সুভাষচন্দ্রের চাইতে যোগ্যতর কে? ফরোয়ার্ড থেকে নিয়ে তাঁকে কর্পোরেশনে বসিয়ে দিলেন দেশবন্ধু। এ-পদে বেতন ছিল তিন হাজার টাকা। কিন্তু সুভাষ সন্ন্যাসী মানুষ। অত টাকা তাঁর প্রয়োজন ছিল না। তিনি কোনদিন বেতন হিসাবে ১৫০০৲ টাকার বেশী নেন নি। পরিশ্রম ক'রতেন দিবা-রাত্রি। ভোর বেলাই বেরিয়ে যেতেন সহর পরিদর্শনে। পরিদর্শন অর্থাৎ সাহেব পাড়ায় ভ্রমণ নয়, নোংরা বস্তীর পথে-পথে চ'লে বেড়ানো।

পরিদর্শন শেষ ক'রে বেলা দুপুর থেকে রা'ত দুপুর পর্য্যন্ত অফিসে বা বাড়ীতে ব'সে অফিসের কাজ করা ছিল তাঁর নিত্যকার কর্ম। অন্যদিকে পলক ফেলবার সময় ছিল না তাঁর। কিন্তু তৎসত্ত্বেও সরকার বাহাদুরের সি, আই, ডি কর্মচারীগণ আবিষ্কার ক'রে ব'সল যে, সুভাষচন্দ্র সন্ত্রাসবাদীদের কার্য্যকলাপে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছেন, এবং ইংরেজ তাড়াবার জন্য তিনি সক্রিয়ভাবে উদ্যোগী হ'য়েছেন। তাই ১৯২৪ সালের ২৫শে অক্টোবর বাংলা সরকারের অর্ডিনান্স অনুসারে গ্রেপ্তার হ'লেন সুভাষচন্দ্র।

দেশবাসী সবাই জা'নত কংগ্রেসকর্মীরা তখন জনে-জনে

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস নীতির আদর্শ অনুসরণে স্বাধীনতা লাভে যত্নশীল হ'য়েছে, তাই সরকারী গুপ্তচর বিভাগের আরোপিত এই অভিযোগে তারা কোন গুরুত্ব আরোপ ক'রতে রাজী হ'ল না। তারা বিবেচনা ক'রল—স্বাধীনতার অহিংস সৈনিকদের কারারুদ্ধ ক'রে স্বাধীনতাসংগ্রামের গতিরোধ করাই সরকারী-কর্মচারীদের উদ্দেশ্য, সুভাষচন্দ্রের নামে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ একান্তই একটা বাজে অছিলা। অভিযোগের মূলে কোন সত্য থাকলে সরকার অবশ্যই সুভাষচন্দ্রকে বিচারালয়ে উপস্থিত ক'রে তাঁকে দণ্ডিত ক'রবার ব্যবস্থা ক'রতেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সুদীর্ঘ কারা-জীবনের ভিতর কোন সময়েই সুভাষচন্দ্র জানতে পারেন নি যে, সত্যি-সত্যি কোন্ অপরাধের দরুণ তাঁকে অবরুদ্ধ করা হ'য়েছে।

সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা হৃত হওয়ায় সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ হ'য়েছিলেন স্বয়ং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। মেয়রের আসন থেকে তিনি মুক্তকণ্ঠে ব'লেছিলেন—

"If love of Country is a crime, I am a criminal. If the Cheif Executive Officer is a criminal, the Mayor is a criminal also." "যদি দেশপ্রেম অপরাধ ব'লে গণ্য হয়, তবে আমিও অপরাধী। (কর্পোরেশনের) প্রধান কর্মকর্তা যদি অপরাধী ব'লে গণ্য হন, তবে মেয়রও অপরাধী।"

বলা বাহুল্য, দেশবন্ধুর এ প্রতিবাদে কর্ণপাত করা প্রয়োজন

বিবেচনা ক'রলেন না দেশের স্বৈরাচারী শাসকবর্গ। তাঁদের প্রয়োজন ছিল—যেরূপে হ'ক দেশের অগ্রগতি নিরুদ্ধ করা। সুভাষচন্দ্রের ভিতরে অনন্যসাধারণ কর্মশক্তি ও অলোকসামান্য নেতৃত্বগুণ লক্ষ্য ক'রে তাঁকে চিরজীবনের জন্য অকর্মণ্য ক'রে দেওয়ার উদ্দেশ্যেই সয়তানীবুদ্ধিপরিচালিত (satanic) গবর্ণমেণ্ট বে-আইনী আইনের বলে তাঁকে ক'রলেন বন্দী। দেশবন্ধু যে সুভাষচন্দ্রকে কতটা ভালবা'সতেন, তা এই সময়েই সাধারণ লোকে বুঝতে পেরেছিল। শত দুঃখে অবিচলিত বীরহৃদয়ও এই আঘাতে মুহ্যমান হ'য়ে প'ড়েছিল। দেশবন্ধুর প্রতিবাদ যেন অভিমন্যুবধে অর্জ্জুনের প্রতিবাদ, বুকের রক্ত যেন সে প্রতিবাদের প্রতি অক্ষরে মাখামাখি হ'য়ে আছে। গুরু শিষ্যের ভিতর এমন অন্তরঙ্গ সম্পর্ক কিছুদিন পূর্বেই এই বাংলাতেই আর একবার দেখা গিয়েছিল—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ও স্বামী বিবেকানন্দের মধ্যে। প্রকৃতই পরমহংসদেব যেমন জা'নতেন—তাঁর আরব্ধ কাজ শেষ ক'রবার ভার বিবেকানন্দের উপর, দেশবন্ধুও তেমনি এ বিষয়ে সচেতন ছিলেন যে, বাংলাদেশে স্বাধীনতার যে হোমানল তিনি জ্বেলেছেন, তাতে পূর্ণাহুতি দেবার মত ব্যক্তি আছেন শুধু এক সুভাষচন্দ্র।

সুভাষচন্দ্রকে কারামুক্ত ক'রবার লোভে দেশবন্ধু ব্রিটিশ-সরকারের সঙ্গে আপোষ ক'রতেও রাজী ছিলেন, এমন ইঙ্গিত কেউ-কেউ ক'রেছেন। সত্য মিথ্যা বলা কঠিন, কিন্তু তাঁর সেরকম ইচ্ছা

থাকলেও, সে ইচ্ছার সুযোগ নেবার মত মতি গতি মোটেই ছিল না গবর্ণমেণ্টের। তাঁরা গায়ের জোরেই কার্য্য সিদ্ধি ক'রবেন, বাঙ্গালী তথা ভারতবাসীকে চোখ রাঙ্গিয়েই পদানত রাখবেন চিরদিন—এই ছিল তাঁদের দুরাশা।

সুভাষচন্দ্রকে হারিয়ে ভগ্ন স্বাস্থ্যে, ভগ্ন হৃদয়ে ১৯২৫ সালের ১৬ই জুন অপরাহ্নে দেশবন্ধু দার্জিলিংয়ে দেহত্যাগ করেন। তাঁর পবিত্র শব কলিকাতায় আনীত হ'লে যে জনতা সেই শবের অনুগমন ক'রেছিল শোকাচ্ছন্ন হৃদয়ে, তাকে বিশাল বা বিরাট ব'ললে তার কোন পরিচয়ই দেওয়া হয় না—সে এক জনসমুদ্র। সারা পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড়ো শবযাত্রা আর দু'একটির বেশী হয় নি।

সুভাষচন্দ্রকে বন্দী ক'রে প্রথমে ক'লকেতা সহরেই রাখা হয়। এ-অবস্থায় প'ড়েও কিছুদিন তিনি জেলখানা থেকেই কর্পোরেশনের কাজকর্ম পরিচালনা ক'রতেন। সুভাষচন্দ্রকে দেশবাসীর সংস্পর্শ থেকে দূরে নিয়ে যাওয়াই ছিল সরকারের উদ্দেশ্য। তাই তাঁরা সুভাষকে দেশ থেকে বিদেশে নিয়ে গেলেন, ক'লকেতার জেল থেকে ব্রহ্মের কারাগারে বদলি ক'রে দিলেন। ইনসিন ও মান্দালয়ের জেলে প্রায় তিন বৎসর কাটাতে হ'য়েছিল সুভাষচন্দ্রকে। এই সময়ে তাঁর স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়। ইনসিন জেলে থাকার কালে, ১৯২৭ সালের প্রারম্ভে তিনি বাংলা গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এক প্রস্তাব পান এই মর্মে যে, তিনি যদি ইউরোপে গিয়ে চিকিৎসিত হ'তে ইচ্ছা

করেন, তবে সরকার তাতে আপত্তি ক'রবেন না। তবে ইউরোপ থেকে দেশে ফিরে আসবার অধিকার তাঁর থাকবে না। সুভাষচন্দ্র বুঝতে পারলেন যে, তাঁকে আরও বিপদ ও কলঙ্কের ভিতর ফেলবার জন্য ইংরেজ সরকারের এ একটা বজ্জাতি মাত্র। তিনি এ-প্রস্তাব সরাসরি প্রত্যাখ্যান ক'রলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে তিনি এ-সম্বন্ধে যে পত্র লিখেছিলেন তা থেকে কয়েক লাইন এখানে উদ্ধৃত করা গেল :—

"সুইট্‌জারল্যাণ্ডে শুধু বৃটিশ গোয়েন্দা নাই, তথায় বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সুইস, ইটালীয়, ফরাসী, জার্মাণ ও ভারতীয় গোয়েন্দা আছে। কোনও-কোনও উগ্র উৎসাহী গোয়েন্দা আমাকে যে সরকারের কাছে গভীর কালিমাময় করিবার জন্য মিথ্যা ঘটনার সুবিস্তৃত বর্ণনা দিবে না, তাহারই বা প্রমাণ কি ?…আমি ইউরোপে যত শান্তভাবে এবং সাবধানতার সহিতই বাস করি না কেন, তাঁহারা ভারত-সরকারের নিকট আমার বিরুদ্ধে অন্যায় রিপোর্ট পাঠাইবেন, আমি কিছু না করিলেও তাঁহারা আমাকে ভীষণ ষড়যন্ত্রের কর্তা বলিয়া রিপোর্ট দিবেন। তাঁহারা কি রিপোর্ট দিতেছেন, আমি কিছুই জানিতে পারিব না। কাজেই কোন কালে এসম্বন্ধে সত্য প্রকাশের বা আমার বিবরণ প্রদানের সম্ভাবনা থাকিবে না। এইভাবে ইহা খুব সম্ভব যে, ১৯২৯ খৃষ্টাব্দ আসিবার পূর্বেই তাঁহারা আমাকে একজন বড় বলশেভিক নেতা বলিয়া জাহির করিয়া দিবেন এবং তাহার

ফলে হয়ত' আমার ভারতে প্রত্যাগমনের পথ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। এই জন্যই আমি স্বেচ্ছায় আমার জন্মভূমি হইতে নির্বাসিত হইতে ইচ্ছা করি না।" এইভাবে সরকারের দুরভিসন্ধি সুভাষচন্দ্রের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির প্রভাবে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল।

মান্দালয় জেলে অবস্থান কালে ১৯২৬ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী সুভাষচন্দ্র ও সেখানকার অন্য রাজবন্দীরা প্রায়োপ-বেশন করেন, কারণ জেল-কর্তৃপক্ষ এঁদের দুর্গাপূজা প্রভৃতি ধর্মানুষ্ঠানের ব্যয় নির্বাহ ক'রতে অস্বীকৃত হন। ৪ঠা মার্চ পর্য্যন্ত অনশনে থাকেন তাঁরা, তারপর জেল-কর্ত্তৃপক্ষের সুমতি হয়। তাঁরা বন্দীদের দাবি মেনে নেন। তখন অনশনও ভঙ্গ হয়।

যাই হ'ক, সুভাষচন্দ্রের স্বাস্থ্য আশানুরূপ ভাবে ভগ্ন হ'য়েছে এবং তাঁর আর সুস্থ হ'য়ে উঠবার আশা নেই দেখে, তাঁর মৃত্যুর দায়টা আর গবর্ণমেণ্ট নিজের কাঁধে রাখতে ইচ্ছা ক'রলেন না। তাঁরা ১৯২৭ সালের ১২ মে তারিখে তাঁকে রেঙ্গুন থেকে ক'লকেতা পাঠালেন, 'এরোণ্ডা' জাহাজে। ১৬ই মে তারিখে বাংলা সরকার তাঁকে বিনাসর্ত্তে মুক্তি দিলেন। গবর্ণমেণ্ট ভেবেছিলেন এক, হ'ল আর-এক। সুভাষচন্দ্র ক্রমে সুস্থ হ'য়ে উঠলেন। ১৯২৮ সালে তিনি আবার কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'লেন—সাইমন-কমিশন বয়কট আন্দোলনের পুরোভাগে।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

ভারতবাসীরা স্বাধীনতার যোগ্য হ'য়েছে কিনা, সেই সম্বন্ধে সন্ধান ও তথ্য সংগ্রহের জন্য ব্রিটিশ-সরকার এই কমিশন নিয়োগ ক'রে পাঠান বিলেত থেকে। এ কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য ছিল না। এই জন্য কংগ্রেস এই কমিশনকে বর্জন করার সিদ্ধান্ত করেন। বাংলাদেশে এই বর্জন আন্দোলন সার্থক ক'রে তুলবার ভার গ্রহণ করেন সদ্যোরোগমুক্ত সুভাষচন্দ্র। তারপর তিনি All Bengal Students Association ও All India Youth Association সংগঠনে বিশেষ সাহায্য করেন। ১৯২৮ সালের মে মাসে তিনি মহারাষ্ট্র প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন—পুণা অধিবেশনে।

১৯২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে ক'লকেতা সহরে কংগ্রেসের ৪৩শ অধিবেশন হয়। ঐ অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন পণ্ডিত মতিলাল নেহরু। অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ছিলেন যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত। সুভাষচন্দ্রের উপর ভার পড়ে, স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনী সংগঠন ও পরিচালনার। তাঁকে G. O. C. (General Officer Commanding) বা সর্বাধিনায়ক পদবী দেওয়া হয়। নারী-বিভাগে অধিনেত্রী ছিলেন শ্রীযুক্তা লতিকা বসু।

সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে মহাত্মা গান্ধীর মতদ্বৈধের প্রথম সূচনা হয় এই কংগ্রেস অধিবেশনের উপলক্ষে। মহাত্মা পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সঙ্গে পরামর্শ ক'রে স্থির করেন যে, বর্ত্তমান অধিবেশনে এই মর্মে প্রস্তাব পাশ করিয়ে নেওয়া হবে যে, পূর্ণ ঔপনিবেশিক

স্বায়ত্তশাসন ভারতকে অবিলম্বে দিতে হবে। এক বৎসরের ভিতর এই দাবী পূরণ না হ'লে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ ক'রবে।

কিন্তু সুভাষচন্দ্র ও তাঁরই পরামর্শে জহরলাল নেহরু স্থির করেন যে, অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শই কংগ্রেসকে দিয়ে গ্রহণ করানো হবে। তাঁদের বিরোধিতা থেকে কোন সঙ্কটের উদ্ভব হ'তে পারে আশঙ্কা ক'রে মহাত্মা গান্ধী অধিবেশনের পূর্ব রাত্রিতে সুভাষচন্দ্র ও জহরলাল উভয়কে ডেকে এনে অনুরোধ ক'রলেন, যেন তাঁদের তরফ থেকে কোন গোলমাল না হয়। তদনুযায়ী জহরলাল গান্ধী-প্রস্তাবের স্বপক্ষেই মত দিলেন—অধিবেশনে দাঁড়িয়ে। কিন্তু বাংলার কংগ্রেসীগণ সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে অবিলম্বে পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণের দিকে ভোট দিলেন। ভোটের জোরে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত-শাসনের প্রস্তাবই পাশ হ'ল বটে, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের অনুগামী-সংখ্যাও যে কংগ্রেসে কম নয়—এটা উপলব্ধি ক'রে তদানীন্তন প্রবীণ কংগ্রেস-নায়কগণ বেশ একটু ভয় খেয়ে গেলেন।

বলা বাহুল্য, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসন প্রস্তাবকে ব্রিটিশ-পার্লামেণ্ট ছেঁড়া-কাগজের মর্য্যাদাও প্রদান ক'রল না। এবং তার ফলে পর বৎসর করাচীতে মিলিত হ'য়ে কংগ্রেস সুভাষেরই সেই পূর্ণ স্বাধীনতা প্রস্তাব গ্রহণ ক'রতে বাধ্য হ'ল। লাভের মধ্যে একটি বৎসর মাটি হ'য়ে গেল নিষ্ফল প্রতীক্ষায়। সংগ্রামবিমুখ

হ'য়ে জাতীয়-জীবনের অগ্রগতি এইভাবে কতবার ব্যাহত হ'য়েছে, তার হিসাব কে রাখে ?

যাই হ'ক, কংগ্রেসের অধিবেশন উপলক্ষে ক'লকেতায় সুভাষচন্দ্র যে সংগঠনী শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা এ-দেশে ইতিপূর্ব্বে আর কখনও দেখা যায় নি। কী সে আশ্চর্য্য শৃঙ্খলাজ্ঞান ও নিয়মানুবর্ত্তিতা! স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সামরিক ভঙ্গী ও কর্ত্তব্য বুদ্ধি সেদিন সমবেত মহাজনতার প্রশংসা অর্জন ক'রেছিল।

আজাদ হিন্দ বাহিনী সংগঠন ক'রে উত্তরকালে যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র, তারই কথঞ্চিৎ প্রাথমিক স্ফুরণ দেখা দিয়েছিল উত্তরবঙ্গ বন্যা রিলিফ ও কংগ্রেস স্বেচ্ছাসেবক-বাহিনীর সংগঠনে। সেদিন সুভাষচন্দ্রের G. O. C. পদবী নিয়ে কতই-না বিদ্রূপ ছোট, বড় সকলের মুখে উচ্চারিত হ'তে শোনা গিয়েছিল! কিন্তু সেই G. O. C.-ই আর-একদিন অক্ষৌহিণী সৈন্যের G. O. C. হ'য়ে প্রমাণ ক'রেছিলেন যে, প্রতিভার পরিচয় গোড়ার খেলার মধ্য দিয়েই আত্মপ্রকাশ করে। নেপোলিয়নও বাল্যক্রীড়ার ছলে একদিন যুদ্ধের মহড়াই দিয়েছিলেন, এ-কথা সবারই মনে রাখা উচিত।

১৯২৯ সালে করাচী-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ হ'ল। কিন্তু সে প্রস্তাব অনাদৃত হ'লে কংগ্রেস কি ক'রবে, এ-বিষয়ে কংগ্রেস-নায়কেরা রইলেন নীরব। একমাত্র সুভাষ-চন্দ্রই ব'ললেন—সে-ক্ষেত্রে আমাদের কর্ত্তব্য হবে সমান্তরাল জাতীয়

গবর্ণমেণ্ট গঠন করা। বলা বাহুল্য, এ-প্রস্তাব গ্রহণ করা ত' দূরের কথা, আলোচনা ক'রবারও সাহস কারও হ'ল না।

১৯২৮ সালে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয়। এ-ব্যাপারে অগ্রণী ছিলেন সুভাষচন্দ্র। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার ও জহরলাল নেহরু ছিলেন এই সঙ্ঘের সদস্য। এই সময়ে একবৎসর কাল তিনি কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক ও তারপর এক বৎসর নিখিল ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সভাপতি ছিলেন।

করাচী-কংগ্রেসে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করার ফলে অহিংসভাবে আইন অমান্য আন্দোলন প্রবর্ত্তন ক'রতে হ'ল গান্ধীজীকে, এর ফলে গবর্ণমেণ্ট আবার ধর-পাকড় আরম্ভ ক'রে দিলেন। ১৯৩০ সালের জানুয়ারীতেই সুভাষচন্দ্রও আবার গ্রেপ্তার হ'লেন। তিনি এই সময়ে কলিকাতায় এক শোভাযাত্রা বা'র করেন—নিখিল ভারত রাজনৈতিক বন্দী দিবস উপলক্ষে। তারই জন্য তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয় নয় মাসের জন্য।

কারাগারে থাকতে-থাকতেই সুভাষচন্দ্র ক'লকেতার মেয়র পদে নির্বাচিত হন। তাঁকে এভাবে নির্বাচিত করার মূলে ছিলেন তাঁর অগ্রজ শ্রীশরৎচন্দ্র বসু, শ্রীযুক্ত নলিনী সরকার, নির্মল চন্দ্র, তুলসী গোস্বামী ও ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়। এঁরা তখন রাজনীতি-ক্ষেত্রে একযোগে কাজ ক'রতেন এবং এঁদের প্রভাব এত বেশী ছিল যে, ষ্টেটস্ম্যান পত্রিকা এঁদের নাম দিয়েছিল, Big Five বা পঞ্চ শক্তিমান।"

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র জেল থেকে বেরিয়ে আসেন ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। ঠিক সেই সময়ে হিজলী-জেলে প্রায়োপবেশন ক'রে দেহত্যাগ করেন যতীন দাস। তাঁর শবদেহ নিয়ে বিরাট মিছিল বা'র করেন সুভাষচন্দ্র।

এ-বৎসর অক্টোবর মাসে হাওড়া রাজনৈতিক সম্মেলনে এবং ডিসেম্বর মাসে অমরাবতী নগরে যুক্তপ্রদেশ ও বেরার ছাত্রসম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন সুভাষচন্দ্র।

মাঝখানে নভেম্বর মাসে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং-কমিটির সভ্যপদ পরিত্যাগ করেন। পূর্বেই ব'লেছি যে, সুভাষচন্দ্র কারাবাস কালেই কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র পদে নির্বাচিত হন। মেয়ররূপেই তিনি ২৬শে জানুয়ারী (১৯৩১) স্বাধীনতা দিবসে কর্পোরেশন থেকে এক শোভাযাত্রা বা'র ক'রে মনুমেণ্টের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু পথেই পুলিশ তাঁকে আটকায় এবং মাথায় লাঠি মারে। তারপর তাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে নিয়ে যায়। পুলিশকোর্ট তাঁকে কারাদণ্ড দিল ছয় মাসের।

মহাত্মা গান্ধী বড়লাট লর্ড আরউইনের সঙ্গে চুক্তি করেন ৫ই মার্চ এবং গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান ক'রবার জন্য বিলাত যান। কংগ্রেস-নেতারা এই চুক্তি উপলক্ষে মুক্তি পেলেন সন্দেহ নেই, কিন্তু সাধারণ কংগ্রেসীরা—যারা আইন অমান্য আন্দোলনে যোগ দিয়ে হাজারে-হাজারে জেলে গিয়েছিল, তারা জেলেই প'ড়ে রইল। যা হ'ক—গোলটেবিলে যোগ দেওয়া

ব্যর্থ হ'ল, ইংরেজ কোন সুবিধাই দিলেন না।

গান্ধীজী গোলটেবিল থেকে ফিরে এলে সুভাষচন্দ্র তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রবার জন্য বোম্বাই রওনা হ'য়ে যান। তিনি ইতিমধ্যে এক Fighting Programme (সংঘর্ষের কর্মসূচী) তৈরী ক'রে রেখেছিলেন। এইটে সম্বন্ধে আলোচনা ক'রবার জন্যই গান্ধীজীর কাছে যান তিনি। তাঁর মত পরিবর্ত্তন করাবার উদ্দেশ্যে মহাত্মা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে নানাস্থানে সফর ক'রে বেড়ান। কিন্তু সুভাষচন্দ্রের মত পরিবর্ত্তিত হবার নয়। তিনি তাঁর সংঘর্ষ-কর্মসূচী দেশের সম্মুখে উপস্থিত ক'রবার জন্য বদ্ধপরিকর হ'য়ে গান্ধীজীর সঙ্গ ত্যাগ ক'রে বাংলা অভিমুখে যাত্রা ক'রলেন। কিন্তু বাংলায় আর তাঁকে পৌঁছুতে হ'ল না। বোম্বাইয়ের পরবর্ত্তী ষ্টেশনেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হ'ল। এ সময় তিনি অসুস্থ ছিলেন ব'লে তাঁকে জব্বলপুর, ভাওয়ালী প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর জায়গায় বন্দী ক'রে রাখা হয়।

স্বাস্থ্য তাঁর ক্রমশঃ অবনতির দিকেই চ'লল। তাই দেখে গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল-বোর্ডের সম্মুখে তাঁকে উপস্থিত ক'রলেন স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য, ১৯৩৩ সালে। মেডিক্যাল-বোর্ডের পরীক্ষায় জানা গেল তাঁর যক্ষ্মা হ'য়েছে। তখন চিকিৎসার জন্য গবর্ণমেণ্ট তাঁকে ভিয়েনায় পাঠালেন।

এইখানে তিনি দেখা পেলেন বিঠলভাই প্যাটেলের, যিনি পূর্বে

কেন্দ্রীয় আইন সভার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন। তিনিও তখন খুবই অসুস্থ। নিজে পীড়িত হ'য়েও সুভাষচন্দ্র তাঁর শুশ্রূষা করেন। সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আলাপের ফলে এতদূর মুগ্ধ হন প্যাটেল যে, মৃত্যুকালে তিনি উইল ক'রে সুভাষচন্দ্রের হাতে একলক্ষ টাকা দেবার ইচ্ছা প্রকাশ ক'রে যান—দেশের কাজ ক'রবার জন্য কিন্তু প্যাটেলের মৃত্যুর পরে তাঁর আত্মীয়েরা এই উইলের বিরুদ্ধে মামলা করেন এবং সুভাষচন্দ্রের হাতে এই টাকাটা পৌঁছায় না।

প্যাটেল ও সুভাষ একযোগে এক বিবৃতি প্রকাশ ক'রেছিলেন ভিয়েনা থেকে—আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ ক'রে দেওয়ার বিরূপ সমালোচনা ক'রে।

এই সময়ে ভিয়েনাতে ব'সেই সুভাষচন্দ্র সংবাদ পান যে, তাঁর পিতা সাংঘাতিক পীড়িত। সংবাদ পেয়েই তিনি স্বদেশে যাত্রা করেন—ভারত গবর্ণমেণ্টের অনুমতির প্রতীক্ষা না ক'রে। দমদম বিমানঘাঁটিতে পৌঁছিবামাত্রই তাঁর উপর আদেশ জারী হ'ল, তিনি স্বগৃহে অন্তরীণ থা'কবেন, এবং সাতদিনের ভিতর আবার ইউরোপ যাত্রা ক'রবেন। দুর্ভাগ্যক্রমে এত ক'রেও সুভাষচন্দ্র পিতাকে দেখতে পেলেন না। তিনি করাচীতে পৌঁছেই জানতে পারেন যে, তাঁর পিতার দেহান্ত হ'য়েছে।

পিতৃশ্রাদ্ধের পরই সুভাষচন্দ্র আবার ইউরোপে যাত্রা করেন। এবার ভিয়েনাতে তাঁর দেহে অস্ত্রোপচার করাহয়। এই সময়ে

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

তিনি ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধ সম্বন্ধে একখানা বই লিখতে সুরু করেন, কিন্তু ডাক্তারের কঠিন শাসনে লেখা বন্ধ ক'রতে বাধ্য হন। এর কিছু পূর্বে Indian struggle বা ভারতীয় যুদ্ধ নামে একখানি ইংরেজী বই তিনি লিখেছিলেন। তা প্রকাশিত হয় লণ্ডন থেকে। কিন্তু ভারতবর্ষে আজপর্য্যন্ত তার প্রকাশ নিষিদ্ধ। আরোগ্য লাভের পর সুভাষচন্দ্র একবার আয়ার্ল্যাণ্ডে যান ১৯৩৬ সালের প্রথম ভাগেই। তারপর তিনি স্বদেশে যাত্রা করেন। কিন্তু বোম্বাই-বন্দরে জাহাজ থেকে নামার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁকে আবার গ্রেপ্তার ক'রে যারবেদা জেলে নিয়ে যাওয়া হয়। তবে সেখানে তাঁকে বেশী দিন রাখেন নি সদাশয় সরকার। এক চূড়ান্ত দয়ার পরিচয় দিয়ে ফেললেন তাঁরা, সুভাষচন্দ্রকে তাঁর মধ্যমাগ্রজ শরৎচন্দ্রের কার্সিয়ংয়ের বাড়ীতে অন্তরীণ ক'রে। কিন্তু তাঁর স্বাস্থ্য আবার ক্ষুণ্ণ হ'ল এবং ক'লকেতায় নিয়ে এসে মেডিক্যাল-কলেজে তাঁকে রাখা হ'ল—চিকিৎসার জন্য।

১৯৩৭ সালের ১৭ই মার্চ সুভাষচন্দ্র বিনাসর্ত্তে মুক্তিলাভ ক'রলেন। এর পরই ক'লকেতার নাগরিকেরা তাঁকে এক বিপুল সম্বর্দ্ধনা প্রদান করেন। তারপর তিনি ডালহৌসী পাহাড়ে যান চিকিৎসার জন্য। এখানে ছয় মাস থেকে তিনি হৃত স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার ক'রে ফিরে আসেন। ১৮ই নভেম্বর তিনি আবার ইউরোপ যান ও আয়ার্ল্যাণ্ডে গিয়ে ডি-ভ্যালেরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

এই সময়ে দেশবাসী তাঁর একনিষ্ঠ দেশসেবার সমুচিত পুরস্কার দিতে প্রস্তুত হ'ল—তাঁকে জাতির করায়ত্ত শ্রেষ্ঠ গৌরবে ভূষিত ক'রে। ১৯৩৮ সালের ১৮ই জানুয়ারী তাঁকে হরিপুরা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচন করা হয়। তখন তিনি ইংলণ্ডে। লণ্ডন থেকে তিনি ক'লকেতায় ফিরে আসেন ২৪শে জানুয়ারী তারিখে। কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগ দেবার জন্য হরিপুরা যাত্রা করেন ১১ই ফেব্রুয়ারী।

কংগ্রেস-সভাপতির কার্যাকাল মাত্র একবৎসর। অক্লান্ত কর্মী সুভাষচন্দ্র এতদিকে এত ব্যাপকভাবে কাজ সুরু ক'রেছিলেন, সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হ'য়ে—যে তাঁর কার্য্যকাল যখন শেষ হ'য়ে এল, তখন তাঁর আরব্ধ কাজ কোনটাই শেষ হয়নি, তাই তিনি দ্বিতীয়বার সভাপতিপদে নির্বাচন প্রার্থী হ'লেন।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

তিন

ভিন্নপথের যাত্রী সুভাষ

কংগ্রেসের নায়কত্ব দীর্ঘদিন ধ'রে যাঁদের হাতে রয়েছে, তাঁরা সুভাষচন্দ্রের মত বিপ্লবীকে দ্বিতীয়বার রাষ্ট্রপতিত্ব লাভের সুযোগ দিতে অনিচ্ছুক হ'লেন। তাঁরা ডাক্তার পট্টভী সীতারামায়াকে সভাপতি পদের প্রার্থীরূপে দাঁড় করালেন। ভোটযুদ্ধে কিন্তু জয়ী হ'লেন সুভাষচন্দ্র। কংগ্রেসের নায়কেরা ক্ষুব্ধ হ'য়ে উঠলেন। স্বয়ং মহাত্মাজী প্রকাশ্যে ঘোষণা ক'রলেন—"এটা আমার ব্যক্তিগত পরাজয়!"

ফলে, সুভাষচন্দ্র নির্বাচনে জয়ী হ'লেন বটে, কিন্তু রাষ্ট্রপতিপদে কাজ ক'রবার সুযোগ পেলেন না। যাঁরা চিরদিন কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সভ্যপদে কাজ ক'রে এসেছেন, তাঁরা হঠাৎ কর্ম ত্যাগ ক'রলেন। নতুন লোক ঐসব পদে নিয়োগ ক'রে পুরাতন প্রধানগণের সঙ্গে সংঘর্ষ জটিল ক'রে তোলা সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছা ছিল না, তিনি একটা আপোষের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা ক'রতে লাগলেন। এপ্রিল মাসে নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির অধিবেশন হ'ল কলকেতায়। কিন্তু অবশেষে, ইস্তফা দিলেন রাষ্ট্রপতিপদে। তাঁর ইস্তফাপত্র সভামণ্ডপে পঠিত হবার পরে সেখানে যে তুমুল বিক্ষোভ উপস্থিত হ'য়েছিল, তাতে স্বয়ং সুভাষচন্দ্র রক্ষা না ক'রলে কংগ্রেস-নায়কগণের অনেকেরই সেদিন লাঞ্ছনা ভোগ ক'রতে হ'ত। নব-নির্বাচিত সভাপতি রাজেন্দ্র প্রসাদকে

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

সুভাষচন্দ্র ও শরৎচন্দ্র নিজেদের গাড়ীতে ক'রে সরিয়ে নিয়ে যান—নিজেদের বাড়ীতে।

যাই হ'ক, রাষ্ট্রপতিত্ব ত্যাগ ক'রে কংগ্রেসের ভিতরেই ফরোয়ার্ড ব্লক নামক একটি কর্মীসংঘ প্রতিষ্ঠা ক'রলেন সুভাষচন্দ্র। এই কারণে এবং আরো দুই একটি কারণে কংগ্রেস-কর্ত্তৃপক্ষ সুভাষচন্দ্রকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি ব'লে ঘোষণা ক'রলেন। তিন বৎসরের জন্য তাঁর উপর এই নিষেধাজ্ঞা জারি হ'ল যে, তিনি কংগ্রেসের কোন কমিটির কোন পদে অধিষ্ঠিত হ'তে পা'রবেন না।

কিন্তু কংগ্রেসের এই জবরদস্ত শাসনের ফলে জন-সমাজে সুভাষচন্দ্রের প্রতিপত্তি বেড়েই চ'লল। ঐ বৎসরই গৌহাটীতে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা করেন নাগরিকেরা, এবং নাগপুরে সাম্রাজ্যবিরোধী সম্মেলনেও তিনি সভাপতিত্ব করেন। তারপর নিখিল ভারত ছাত্র সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন তিনি। সবার চাইতে বড় কথা এই যে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর বীরত্ব ও ত্যাগে এতদূর মুগ্ধ এবং তাঁর বিরোধীদের জবরদস্তিমূলক কার্য্যকলাপে এতদূর বিচলিত হ'য়েছিলেন যে, এই সময়ে তিনি "দেশ-নায়ক" নামক একটি প্রবন্ধ লিখে সুভাষচন্দ্রকে অতিমাত্র প্রশংসা এবং তাঁকে বাংলার অবিসম্বাদী নেতারূপে বরণ করেন। এই প্রবন্ধ থেকে দুই চারি লাইন উদ্ধৃত করা যাচ্ছে এখানে :—

"বাঙ্গালী কবি আমি, বাংলা দেশের হ'য়ে তোমাকে দেশ-নায়কের পদে বরণ করি।…সুভাষচন্দ্র! তোমার রাষ্ট্রিক সাধনার

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

আরম্ভক্ষণে তোমাকে দূর থেকে দেখেছি। সেই আলো-আঁধারের অস্পষ্ট লগ্নে তোমার সম্বন্ধে কঠিন সন্দেহ জেগেছে মনে, তোমাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ক'রতে দ্বিধা অনুভব ক'রেছি, কখনো-কখনো দেখেছি তোমার ভ্রম, তোমার দুর্বলতা, তা নিয়ে মন পীড়িত হ'য়েছে। আজ তুমি যে আলোকে প্রকাশিত, তাতে সংশয়ের আবিলতা নেই, মধ্যদিনে তোমার পরিচয় সুস্পষ্ট। বহু অভিজ্ঞতাকে আত্মসাৎ ক'রেছ তুমি, কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে দেখলুম তোমার যে পরিণতি, তা থেকে পেয়েছি তোমার প্রবল জীবনীশক্তির প্রমাণ। এই শক্তির কঠিন পরীক্ষা হ'য়েছে কারাদুঃখে, নির্বাসনে, দুঃসাধ্য রোগের আক্রমণে; কিছুতে তোমাকে অভিভূত করে নি, তোমার চিত্তকে ক'রেছে প্রসারিত, তোমার দৃষ্টিকে নিয়ে গেছে দেশের সীমা অতিক্রম ক'রে ইতিহাসের দূরবিস্তৃত ক্ষেত্রে। দুঃখকে তুমি ক'রে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে ক'রেছ সোপান। সে সম্ভব হ'য়েছে, যেহেতু কোন পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য ব'লে মানো নি। তোমার এই চারিত্র-শক্তিকেই বাংলা দেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত ক'রে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর।…হিংস্র দুঃসময়ের পিঠের উপরে চ'ড়েই বিভীষিকার পথ উত্তীর্ণ হ'তে হবে, এই দুঃসাহসিক অভিযানে উৎসাহ দিতে পা'রবে তুমি, এই আশা ক'রে তোমাকে আমাদের যাত্রানেতার পদে আহ্বান করি।… বহুকাল পূর্বে একদিন আর এক সভায় আমি বাঙ্গালী সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলাম। তার

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

বহুবৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলা দেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরণ ক'রছি। দেহে মনে তাঁর সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে সহযোগিতা ক'রতে পা'রব, সে সময় আজ গেছে। শক্তিও অবসন্ন। আজ আমার শেষ কর্ত্তব্যরূপে বাংলা দেশের ইচ্ছাকে কেবল আহ্বান ক'রতে পারি। সেই ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাকে পূর্ণ শক্তিতে প্রবুদ্ধ করুক, কেবল এই কামনা জানাতে পারি। তারপরে আশীর্বাদ ক'রে বিদায় নেব—এই জেনে যে—দেশের দুঃখকে তুমি তোমার আপন দুঃখ ক'রেছ, দেশের সার্থক মুক্তি অগ্রসর হ'য়ে আসছে তোমার চরম পুরস্কার বহন ক'রে।"

১৯৪০ সালের জানুয়ারী মাসে সুভাষচন্দ্র কলিকাতায় মহাজাতি সদনের সূত্রপাত করেন। ভিত্তি স্থাপন ক'রেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর অভিভাষণেও তিনি সুভাষচন্দ্রকে বিশেষরূপ প্রশংসা করেন।

ঐ বৎসরই ১৮ই মার্চ রামগড়ে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। সুভাষচন্দ্রও কংগ্রেসের পাশেই আপোষ-বিরোধী কংগ্রেস-সম্মিলনের অনুষ্ঠান করেন। মূল কংগ্রেসের চাইতে এই সম্মিলনে জন সমাগম হ'য়েছিল বেশী।

এই সময়ে কলিকাতায় অন্ধকূপহত্যার কল্পিত নিদর্শন হলওয়েল মনুমেণ্ট অপসারণের জন্য সুভাষচন্দ্র আন্দোলন সুরু করেন ও সে আন্দোলন সাফল্যমণ্ডিত হয়।

২রা জুলাই তারিখে সুভাষচন্দ্রকে আবার গ্রেপ্তার করা হয়। ২৯শে নভেম্বর তিনি প্রায়োপবেশন আরম্ভ করায় ৫ই ডিসেম্বর

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

তারিখে গবর্ণমেন্ট মুক্তি দেন সুভাষচন্দ্রকে। এই মুক্তি দেওয়ার ফলে ভারতে ইংরেজ রাজ্য কত বড় আঘাত পাবে, তা আগে থেকে জানলে গবর্ণমেন্ট যে তাঁকে মুক্তি দিতেন না, এ কথা জোর ক'রেই বলা যায়। সুভাষচন্দ্র এইবার বুঝতে পা'রলেন যে, ভারতে ব'সে থেকে ভারতের মুক্তির জন্য বিশেষ কিছুই করা যাবে না। একদিকে অত্যাচারী ইংরেজ সরকার, অন্যদিকে অহিংসাপন্থী কংগ্রেস—এই দুইয়ের শাসন মাথায় নিয়ে পথ চ'লতে হ'লে, সে-চলার গতি হবে অতি-মন্থর, পদে পদে বিঘ্নসঙ্কুল। তাই তিনি মনস্থ ক'রলেন ভারতের বাইরে বেরিয়ে গিয়ে কাজ সুরু ক'রে দেওয়া, যেখানে ইংরেজের হিংসা এবং কংগ্রেসের অহিংসা এ-দুইয়েরই নাগালের বাইরে থাকবেন তিনি। তিনি ভারত ত্যাগ ক'রতে সঙ্কল্প ক'রলেন, কিন্তু তখনও তাঁর বিরুদ্ধে চ'লছে পুলিশ কোর্টে মামলা, তাঁকে যেতে দেবে কেন পুলিশ? তাই তিনি গোপনে পলায়ন ক'রবেন স্থির ক'রলেন।

এলগিন রোডের বাড়ীতে তিনি নির্জনবাস আরম্ভ ক'রলেন। র'টে গেল যে, তিনি অকস্মাৎ যোগ সাধনায় মন দিয়েছেন। কেউ অবিশ্বাস ক'রল না—কারণ ছাত্রজীবনে সন্ন্যাসগ্রহণ ক'রেছিলেন তিনি একবার—তা সবাই জানত। পুলিশ বোধ হয় উৎফুল্লই হ'ল—কারণ এই বিপজ্জনক ব্যক্তি কৌপীন প'রে সংসার ত্যাগ ক'রে গেলে তাদের অনেক ঝঞ্ঝাট ক'মে যায়।

সুভাষচন্দ্র সারা দিন নিজের ঘরটিতে দ্বার রুদ্ধ ক'রে ব'সে

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

যোগাভ্যাস করেন। নির্দিষ্ট সময়ে ভৃত্য গিয়ে খাবার দিয়ে আসে—এই খবর পেয়ে পুলিশ নিশ্চিন্ত মনে তাঁর বাড়ী ঘিরে ব'সে রইল। তাদের সমুখ দিয়েই ১৭ই জানুয়ারী রাত্রে মোটরে উঠে এক পশ্চিমা মুসলমান বেরিয়ে চ'লে গেল ৩৮।২ এলগিন রোডের বাড়ী থেকে, কেউ সন্দেহ ক'রল না যে, ইনিই সুভাষচন্দ্র। এ-যেন ফলের ঝুড়িতে চেপে শিবাজীর দিল্লী থেকে পলায়ন।

সুভাষচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র শিশির বসু এই মোটরে ক'রে সুভাষকে নিয়ে গেলেন, গোমো ষ্টেশনে—বাংলার সীমার বাইরে। গোমোতে সুভাষচন্দ্র পশ্চিমগামী রেল গাড়ীতে উঠে ব'সলেন। শিশিরকুমার ক'লকেতায় ফিরে এলেন। তখনও সুভাষচন্দ্রের পরিধানে সেই মৌলভীর পরিচ্ছদ। বলা বাহুল্য, এই ছদ্মবেশ ধারণ না ক'রলে সুভাষচন্দ্রের মত সর্বজনপরিচিত ব্যক্তির পক্ষে সারা ভারতের বুকের উপর দিয়ে সকলের অজ্ঞাতে পার হ'য়ে যাওয়া সম্ভব হ'ত না। পেশোয়ারে গিয়ে মৌলভীবেশ ত্যাগ ক'রে তিনি সাধারণ পাঠানের বেশ ধারণ ক'রলেন। এই সময়ে রহমান নামে এক পাঠান তাঁর সহচর ছিল। সুভাষচন্দ্র কি ক'রে তাকে সংগ্রহ ক'রলেন, তা জানা যায়নি। পথে দুঃসহ কষ্ট সহ্য ক'রে এবং বহুবার ধরা প'ড়তে-প'ড়তে বেঁচে গিয়ে অবশেষে পাঠান-বেশী সুভাষচন্দ্র কাবুল সহরে পৌছালেন। সেখানে এক নোংরা সরাই-খানার আঁধার ঘরে মাথা গুঁজে থেকে সন্ধান ক'রতে লাগলেন কোথা থেকে কি উপায়ে সাহায্য পাওয়া যায়। সাহায্য ক'রতে

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

এগিয়ে এলেন শেঠ উত্তমচাঁদ। তাঁর রেডিওর দোকান ছিল কাবুলে। তিনি আশ্রয় দিলেন পলায়মান দেশনেতাকে। তাঁরই সাহায্যে জার্মাণ রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন ক'রলেন সুভাষচন্দ্র এবং অবিলম্বে বার্লিনে নীত হ'লেন জার্মান বিমানপোতে। এই সাহায্যের জন্য উত্তরকালে উত্তমচাঁদকে ইংরেজ সরকারের হাতে নির্মম নিপীড়ন সহ্য ক'রতে হ'য়েছে।

১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে সুভাষচন্দ্রকে রেডিওতে বক্তৃতা ক'রতে শোনা গেল। আজাদ হিন্দ ষ্টেশন থেকে তিনি ভারত-বাসীকে সম্বোধন ক'রে ব'ললেন :

"আমি সুভাষ। আমি যেভাবে ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্ট‌কে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন ক'রে ভারতবর্ষ থেকে চ'লে এসেছি, ঠিক তেমনি ক'রেই আবার উপযুক্ত সময়ে আপনাদের মধ্যে গিয়ে উপস্থিত হব। সে সুযোগ আসছে, সেটা সম্পূর্ণভাবে যাতে কাজে লাগা'তে পারেন—তার জন্য নিজেরা জাতিধর্মনির্বিশেষে অবিলম্বে সংঘবদ্ধ হোন—চাই ঐক্য, চাই একাগ্রতা!"

১৯৪২ সালের ২২শে মার্চ হঠাৎ রটনা হ'ল যে, বিমান দুর্ঘটনায় সুভাষচন্দ্রের মৃত্যু হ'য়েছে। পরে জানা গেল সংবাদটি মিথ্যা। তারপর এপ্রিল মাসে বিলাতের মন্ত্রিসভা স্বীকার ক'রলেন যে, সুভাষচন্দ্র জীবিতই আছেন এবং জার্মানীতে ব'সে আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন ক'রেছেন।

বার্লিনে পৌঁছে সুভাষচন্দ্র হিটলারের নিকট সমাদর লাভ

করেন। এখানে তিনি প্রবাসী ভারতীয়দের সংস্পর্শে আসেন এবং অচিরে এক স্বেচ্ছাসেবক সৈন্য বাহিনী গ'ড়ে তোলেন। এই বাহিনীতে দেখতে-দেখতে চা'র হাজার সৈনিক পাওয়া গেল। তা'দের সামরিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত ক'রে তোলা হ'ল অল্প দিনের ভিতরই। আজাদ হিন্দ সঙ্ঘ গ'ড়ে তুলে তার শাখা প্রতিষ্ঠা ক'রলেন তিনি ইউরোপের বিভিন্ন সহরে। ভারত সরকারের বিপক্ষে এবং ভারতীয়দের স্বাধীনতা সংগ্রামের সমর্থনে অবিরত প্রচার কার্য চ'লতে লাগল। আজাদ হিন্দ নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশ করা হ'ল—তা ছাড়া রেডিও মারফত প্রচারণা ত ছিলই। তিনটি রেডিও-কেন্দ্র ছিল সুভাষচন্দ্রের হাতে—আজাদ হিন্দ রেডিও, ন্যাশনাল কংগ্রেস রেডিও ও আজাদ মুসলিম রেডিও।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

চার

আজাদ হিন্দ ফৌজ

ইউরোপে প্রচারণা ও আজাদ হিন্দ ফৌজ সংগঠন ক'রে বিশেষ সুফল পে'লেন না সুভাষচন্দ্র। তাঁর উদ্দেশ্য হ'ল, ভারতবর্ষের শৃঙ্খল মোচন। কিন্তু ইউরোপ থেকে ভারতবর্ষের নাগাল পাওয়া তখন দুঃসাধ্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন তাণ্ডব নৃত্য ক'রছে জলে, স্থলে ও ব্যোমপথে। দু'চার মাইল রাস্তা অতিক্রম ক'রে যোগাযোগ স্থাপন করাই দুঃসাধ্য, তা ভারত ত' ছয় হাজার মাইল তফাতে। তাই সুভাষচন্দ্র চেষ্টা করতে লাগলেন, পূর্ব-এশিয়ায় আ'সতে। জাপানও ইঙ্গমার্কিণ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রেছে। পূর্ব-এশিয়ায়ও চলেছে ভীষণ যুদ্ধ। সেখান থেকে ভারতবর্ষের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা সহজ হবে মনে ক'রে সুভাষচন্দ্র জাপানে আসবার চেষ্টা ক'রতে লাগলেন। কিন্তু পথ বিপদসঙ্কুল।

এই সময়ে সিঙ্গাপুরে যুদ্ধবন্দী ভারতীয়দের নিয়ে এক আজাদ হিন্দ ফৌজ গ'ড়ে উঠেছে। তার নাম I. N. A. (ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি, বা ভারতীয় জাতীয় সৈন্যদল)। জাপানীদের প্রেরণাতে, জাপানপ্রবাসী রাসবিহারী বসুর উদ্যোগে এই বাহিনীর সৃষ্টি। রাসবিহারী বসু ভারতের অগ্নিযুগের কর্মী। দিল্লীতে বড়লাট হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপ ক'রে তিনি পলাতক হন। জাপানে উপস্থিত হ'য়ে সেখানে তিনি প্রসিদ্ধি

লাভ করেন ও রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ প্রভৃতির সহযোগে ভারতের মুক্তি সাধনায় ব্রতী হন। সুযোগ এল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে।

আই, এন,, এ গ'ড়ে তুলবার ভার প'ড়ল জেনারেল মোহন সিংহের উপর। তাঁর সহকর্মী ছি'লেন জেনারেল ভোঁসলে, কর্ণেল কিয়ানী প্রভৃতি। কয়েক হাজার সৈন্য প্রস্তুতও হ'ল। তখন জাপানী কর্ত্তারা আদেশ দিলেন ঐ বাহিনীকে ব্রহ্মে পাঠিয়ে ইংরেজের বিপক্ষে নিয়োগ ক'রবার জন্য। মোহন সিং এতে রাজী হ'লেন না। জাপানীর তাঁবেদার হ'য়ে লড়াই করার মতলব তাঁর ছিল না। তাই জাপানীরা বন্দী ক'রল মোহন সিংকে। আই, এন, এ ভেঙ্গে গেল।

কিন্তু জাপানীরা আবার আই, এন, এ পুনর্গঠনের চেষ্টা ক'রতে লা'গল। রাসবিহারী বসু জেনারেল ভোঁসলে ও কিয়ানীকে নিয়ে গ'ড়ে তুললেন নতুন বাহিনী। কিন্তু সবাই বুঝতে পা'রল— এভাবে কাজ অগ্রসর হবে না। একজন সুযোগ্য সমরনায়ক যতক্ষণ না পাওয়া যাবে, ততক্ষণ আই, এন, এ'তে প্রাণ সঞ্চার করা সম্ভব নয়। সকলে ব'লতে লা'গল সুভাষচন্দ্রের কথা। তাঁকে যদি বার্লিন থেকে পূর্ব-এশিয়ায় নিয়ে আসা যায়, তবেই ভারতীয় বাহিনী দ্বারা ভারত উদ্ধার সম্ভব হ'তে পারে। পূর্ব-এশিয়ার জাপানী সেনাপতিরা জাপানে রিপোর্ট দিলেন— "সুভাষচন্দ্রের নিরাপদে পূর্ব-এশিয়ায় পৌঁছোনোর আশা হ'চ্ছে শতকরা ৫ ভাগ। ৯৫ ভাগ হ'ল দুরাশা। তবু সুভাষচন্দ্রকে

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

চাই। যদি আই, এন, এ'কে দিয়ে কাজ করা'তে হয়, তবে সুভাষচন্দ্রকে চাই। যদি ভারত সীমান্তে গিয়ে ইংরেজ সরকারকে আঘাত হা'নতে হয়, তবে সুভাষচন্দ্রকে একান্তই চাই।"

এই কথার উপরে জাপ গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হ'য়েই সুভাষচন্দ্রকে আমন্ত্রণ ক'রে পাঠালেন। পথের বিপদের কথা বিন্দুমাত্র গোপন করা হ'ল না। তাঁর নিরাপদে পৌঁছোনোর আশা যে শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র, তাও তাঁকে স্পষ্ট বলা হ'ল। সব শুনেও সুভাষ সাব-মেরিণে চ'ড়ে জাপান যাত্রা ক'রলেন। মাডাগাস্কার পর্য্যন্ত এলেন জার্মাণ সাবমেরিণে। সেখান থেকে এক জাপানী সাবমেরিণ তাঁকে নিয়ে এল পিনাং-এ। ১৯৪৩ সালের জুন মাসে তিনি জাপানে পদার্পণ ক'রলেন। তার পরই ঘটনার স্রোত দুর্বার বেগে ধাবিত হ'ল।

১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই সিঙ্গাপুরে ভারতীয় স্বাধীনতা-সঙ্ঘের এক অধিবেশন হ'ল। এই সভায় রাসবিহারী বসুর হাত থেকে স্বাধীনতা সঙ্ঘের ও আই, এন, এ'র পরিচালনার কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ ক'রলেন সুভাষচন্দ্র। বিপুল উদ্দীপনার ভিতর তিনি ঘোষণা ক'রলেন যে, অবিলম্বে জাতীয় বাহিনী ও জাতীয় সরকারের প্রতিষ্ঠা হবে। দেখতে দেখতে চারিটি সামরিক শিক্ষা শিবির প্রতিষ্ঠিত হ'ল, ৭০০০ সৈনিক তাতে শিক্ষা পেতে লা'গল। শিক্ষাশিবিরের সংখ্যা বাড়িয়ে আটটি করা হ'ল ক্রমশঃ।

মেয়েদের জন্যও সৈন্য-বাহিনীতে স্বতন্ত্র একটি বিভাগ

খোলা হ'ল। এই বিভাগের নাম ছিল— "ঝাঁসীর রাণী বাহিনী" ও এর অধিনেত্রী ছিলেন ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন। ঝাঁসীর রাণী বাহিনীর ভিতর আবার দু'টি বিভাগ ছিল। একটি শুশ্রূষা বিভাগ, অন্যটি সৈন্য বিভাগ। প্রথম দলের মেয়েরা আহত সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষা নিয়েই ব্যস্ত থা'কতেন সর্বদা, দ্বিতীয় দলে ছিলেন নারী-যোদ্ধৃদল, তাঁরা পুরুষদের মতই অস্ত্র হাতে নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতেন। হাতাহাতি যুদ্ধেও তাঁদের বীরত্বের বহু পরিচয় দিয়েছিলেন নারীবাহিনীর সৈনিকেরা।

অবশেষে ১৯৪৩ সালের ২১শে অক্টোবর তারিখে শুভদিনে ভারতের অস্থায়ী স্বাধীন গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হ'ল—আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট। এই উপলক্ষে সুভাষচন্দ্র নব-প্রতিষ্ঠিত গবর্ণমেণ্টের পরিচালকরূপে এক ঘোষণা-বাণী পাঠ করেন। তাতে সিপাহী-যুদ্ধ থেকে আরম্ভ ক'রে ভারতীয় স্বাধীনতা-সংগ্রামের বিভিন্ন স্তর ও পর্য্যায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণী দেওয়া হয়েছিল এবং আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্টের ভিতর দিয়ে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সর্বরকমে আপ্রাণ চেষ্টা করবার সঙ্কল্প ঘোষিত হ'য়েছিল। আজাদ হিন্দ সরকারের নায়করূপে নির্বাচিত হলেন শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু। তিনি প্রধান সচিব, সমর-সচিব, পররাষ্ট্র সচিব এবং জাতীয় বাহিনীর সর্বাধিনায়ক পদেও বৃত হলেন সঙ্গে-সঙ্গে। অন্যান্য দপ্তরের বণ্টন হ'য়েছিল নিম্নলিখিতরূপ :—

ক্যাপ্টেন লক্ষ্মী স্বামীনাথন—নারী সংগঠন। শ্রী এম, এ,

আয়ার—প্রচার ও আন্দোলন। লেপ্টন্যাণ্ট কর্ণেল এ, সি, চ্যাটার্জি—অর্থ-সচিব। লেঃ কঃ আজিজ আহম্মদ; লেঃ কঃ এন্, এস, ভাগত; কর্ণেল জে, কে, ভোঁসলে; লেঃ কঃ গুলজারা সিং; লেঃ কঃ এম, জেড, কিয়ানী; লেঃ কঃ এ, পি, লোকনাথন; লেঃ কঃ ইশান কাদির; লেঃ কঃ শাহ নওয়াজ—সেনাবাহিনীর প্রতিনিধিগণ। শ্রী এ, এম, সহায়—সম্পাদক (সচিব-যোগ্য সম্মানের অধিকারী)। শ্রীরাসবিহারী বসু—প্রধান পরামর্শদাতা। জনাব করিম গনি; শ্রীদেবনাথ দাস; জনাব ডি, এম, খাঁ; এ, ইয়ালাপ্পা জে, থিবি; সর্দার ইশার সিং—পরামর্শদাতা। শ্রী এ, এন, সরকার—আইন-বিষয়ক পরামর্শদাতা।

আজাদ হিন্দ সরকারের হেড-কোয়ার্টার্স হ'ল সিঙ্গাপুর। পরে অবশ্য এটা স্থানান্তরিত হ'য়েছিল রেঙ্গুনে। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে আজাদ হিন্দ বাহিনী ও সরকারের সামরিক ধ্বনি স্থির হ'ল—"চলো দিল্লী", সম্ভাষণ হ'ল—"জয় হিন্দ" এবং পতাকা হ'ল—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ত্রিবর্ণ পতাকা।

আজাদ হিন্দ গবর্ণমেণ্ট জার্মাণী, ইতালী, জাপান ও তাদের মিত্রস্থানীয় অপর ছয়টি রাষ্ট্র কর্ত্তৃক স্বীকৃত হ'ল। এবং এর অর্থ-ভাণ্ডার আশাতিরিক্তরূপে পুষ্ট হ'তে লাগল পূর্ব-এশিয়া-প্রবাসী ভারতীয়গণের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত সাহায্যে। মুক্তহস্তে দেশের কাজে দান ক'রে সবাই যেন ধন্য হ'তে লাগল। অনেক ধনী ব্যক্তি

যথাসর্বস্ব আজাদ হিন্দ সরকারের ধনভাণ্ডারে দান ক'রে নিজেরাও সপরিবারে বাহিনীর সাধারণ সৈনিক পদ গ্রহণ করেছিলেন।

রেঙ্গুনে 'আজাদ হিন্দ ব্যাঙ্ক নামে' একটি ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন সুভাষচন্দ্র। জাতীয় সরকারের আর্থিক লেন-দেন এরই মারফত চ'লত। বর্মা ও মালয়ের বহুস্থানে জাতীয় বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাও ক'রেছিলেন সুভাষচন্দ্র। সে-সব বিদ্যালয়ে অবশ্য-পঠনীয় ছিল ভারতের কীর্ত্তি-কাহিনী-সম্বলিত ইতিহাস—যাতে ক'রে হিন্দু মুসলমান বৌদ্ধ সর্বধর্মের বালকবালিকার মন দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ হ'য়ে ওঠে। ধর্মশিক্ষা সযত্নে বর্জিত হ'য়েছিল এ-সব বিদ্যালয় থেকে, কারণ ধর্মের উপর জোর দিতে গেলেই হিন্দু মুসলমানে অনৈক্য এসে পড়ে। বস্তুতঃ সুভাষচন্দ্রের অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি যদি কিছু থাকে, তবে তা হ'চ্ছে আজাদ হিন্দ বাহিনী ও গবর্ণমেণ্ট থেকে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির মূলোৎপাটন। তাঁর লক্ষ লক্ষ অনুগামীর ভিতর নারী পুরুষ শিশু নির্বিশেষে প্রত্যেকে নিজেকে মনে ক'রত প্রথমতঃ, দ্বিতীয়তঃ এবং সর্বতোভাবে ভারতীয় (Indian first, Indian second, Indian at all times)। কে হিন্দু, কে মুসলমান—সে-প্রশ্নই জাগত না কারও মনে। কী যাদুমন্ত্রে সুভাষচন্দ্র সবার মন থেকে সাম্প্রদায়িকতা বিদূরিত ক'রেছিলেন, তা তিনিই জানেন। ভারতের মহান্ নেতৃবর্গের মধ্যে অন্য কারও সে যাদু জানা

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

নেই, থাকলে ভারতে আজ হিন্দু মুসলমানের হানাহানি অবাধে চ'লত না।

সুভাষচন্দ্র 'ঝাঁসীর রাণী বাহিনী' নাম দিয়ে এক নারীসেনাদল গঠন ক'রেছিলেন, তা বলা হয়েছে। তিনি একটি বাল-সেনাদলও প্রতিষ্ঠা ক'রেছিলেন। দশ-বারো-চৌদ্দ বৎসরের বালক-বালিকারাও সামরিক শিক্ষা গ্রহণ ক'রত এই বালসেনায় ভর্ত্তি হয়ে।

আজাদ-হিন্দ সরকারের রাষ্ট্রদূত ত' জার্মাণী, জাপান প্রভৃতি মিত্রশক্তির দরবারে ছিলই, তা ছাড়া বর্মা, মালয় ও শ্যামদেশে ভারতীয় স্বাধীনতা সঙ্ঘের অসংখ্য শাখা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। এখান থেকে ভারতের স্বপক্ষে প্রচার কার্য্য অবিরত চালান হ'ত।

সুভাষচন্দ্রের প্রভাব ছিল অসাধারণ—পূর্ব-এশিয়ায়। তাঁর নাম শুনেই সর্বত্র ভারতীয়গণ শ্রদ্ধায় এবং অভারতীয়গণ সম্ভ্রমে মস্তক অবনত ক'রত। এ-রকম শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম খুব অল্পসংখ্যক নেতার ভাগ্যেই জোটে। জাপানী সৈনিকেরা তাদের নিজেদের সেনাপতিদের চাইতে সুভাষচন্দ্রকে সম্মান ক'রত বেশী। জাপান-গবর্ণমেণ্টের কর্ণধারগণ সর্বদাই সর্ববিষয়ে সুভাষচন্দ্রের মর্য্যাদা রেখে কথা কইতেন ও কাজ ক'রতেন। প্রধান মন্ত্রী তোজো তাঁকে অত্যন্ত সম্মান ক'রতেন। ভারত-আক্রমণের ব্যাপারে জাপানী-সমরনায়কদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মতদ্বৈধ ঘ'টত প্রায়ই, কিন্তু সুভাষচন্দ্রের ইচ্ছার বিরুদ্ধে এ-ব্যাপারে কোন কাজই

হ'তে দিতেন না তোজো। জাপ-সরকারের সঙ্গে আজাদ হিন্দ সরকার সমকক্ষের মতই আচরণ ক'রত। কখনও জাপানের তাঁবেদারী করে নি আজাদ হিন্দ বাহিনী।

ভারতে সামরিক অভিযান চালানোর অধিকার একমাত্র আজাদ-হিন্দ বাহিনীরই আছে, জাপানী সেনার নেই, এ-কথা সুভাষচন্দ্র স্পষ্টভাষায় জানিয়ে দিলেন। তারপর তিনি ভারতে অভিযানের জন্য তৈরী হ'তে লাগলেন। তখন আজাদ-হিন্দ বাহিনীতে সৈন্য ছিল পঞ্চাশ হাজার, অফিসার ছিল পনেরো শত। সে অনুপাতে তাদের সামরিক সরঞ্জাম কম ছিল। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ট্যাঙ্ক, বোমারু বিমান—এ-সবের কথা বলা যেতে পারে। বিমানপোত না থাকায়, কোহিমাতে পৌছে রসদের সরবরাহ পেলে না আজাদ-হিন্দ বাহিনী। জাপানীরা এ-বিষয়ে সাহায্য ক'রবে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু কার্য্যকালে, অবস্থার চাপে প'ড়েই বোধহয়, তারা সে প্রতিশ্রুতি রক্ষা ক'রতে পারে নি। তা যদি পা'রত, তাহ'লে কোহিমা জয়ের পর আজাদ হিন্দ সৈন্যকে পশ্চাদপসরণ ক'রতে হ'ত না, এবং ভারতের ইতিহাস অন্য রূপ ধারণ ক'রত।

সুভাষচন্দ্রের প্রেরণায় পূর্ব-এশিয়া-প্রবাসী ভারতীয়গণ আজ প্রথম ভারতীয় ব'লে গর্ব ও গৌরব অনুভব ক'রতে লা'গল। ভারতের মহান ঐতিহ্যের কথা সুভাষই তাদের স্মরণ করিয়ে দিলেন, স্বাধীনতা অর্জনের গৌরবোজ্জ্বল কিন্তু দুর্গম পন্থা তাদের

দেখিয়ে দিলেন। তাই জনগণ তাঁকে ভক্তিপ্লুতকণ্ঠে সম্ভাষণ ক'রল, "নেতাজী" নামে। তিনি হ'লেন নিখিল ভারতীয়ের নেতাজী। দুনিয়ায় নেতা আছে সব দেশেই। কিন্তু নেতাজী ছিলেন এক, এবং তিনি ভারতেরই 'নেতাজী'।

১৯৪৪ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ভারতের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় শুভদিন। ঐদিন স্বাধীন ভারতের বাহিনী ভারতের অধীনতাশৃঙ্খল চূর্ণ ক'রবার জন্য ভারতসীমান্তের দিকে অগ্রসর হ'ল। "চলো-দিল্লী" সমরনিনাদ পঞ্চাশ সহস্র কণ্ঠ থেকে যুগপৎ ধ্বনিত হ'য়ে ভারত-ব্রহ্মসীমান্তকে ক'রে তুলল উচ্চকিত, সন্ত্রস্ত। সে অভিযানের বিবরণ দীর্ঘ। তা এখানে সবিস্তারে বর্ণনা ক'রবার স্থান নেই। আজাদ-হিন্দ ফৌজের সে শৌর্য্যগাথার পরিচয় আমরা পরে দেব অন্য গ্রন্থের ভিতর দিয়ে।

অভিযান সুরু হওয়ার প্রাক্কালে যে উন্মাদনাময়ী বাণী দিয়েছিলেন নেতাজী—তাঁর সৈন্যদের উদ্দেশ ক'রে—তার প্রত্যেকটি শব্দ যেন এক একটি বুলেট।

"There, there in the distance—beyond that river, beyond those jungles, beyond those hills, lies the promised land, the soil from which we sprang, the land to which we shall now return.

Hark! India is calling. India's metropolis Delhi is calling. Three Hundred Eighty Eight

millions of our countrymen are calling. Blood is calling unto Blood. Get up! We have no time to lose! Take up your arms, there in front of you is the road, that our pioneers have built. We shall march along that road, we shall carve our way through the enemy's ranks, or if God wills, shall die a martyr's death.

And in our last sleep we shall kiss the road that will bring our army to Delhi. The road to Delhi is the road to freedom.

"Chalo—Delhi."

দূরে—বহুদূরে—নদী-পারে, পাহাড়-জঙ্গলের ও-পিঠে—ঐ হোথায় আমাদের দেশ, যে-দেশের মাটিতে আমরা জন্মেছি। ঐ দেশেই আমাদের ফিরে যাবার কথা, ঐ দেশেই আমরা চ'লেছি ফিরে।

শোন! ভারতবর্ষ আমাদের ডাকছে—ভারতের প্রাণকেন্দ্র দিল্লীর আহ্বান ঐ শোন! আটত্রিশ কোটি দেশবাসীর ঐ শোন আহ্বান! যারা পাঠিয়েছে ঐ আহ্বান, তাদের ধমনীতে আর আমাদের ধমনীতে বইছে একই রক্ত। আর দেরী নয়, ওঠো! অস্ত্র নাও, ছুটে চল ঐ পথ বেয়ে, যা আমাদের পুর্বগামী স্বাধীনতার সৈনিকেরা গ'ড়ে রেখে গেছেন আমাদের

জন্য। আমরা চ'লব ঐ পথ বেয়ে! শত্রু-সেনার ব্যূহ ভেদ ক'রে আমরা পথ ক'রে নেব—নয় ত' ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, শহীদের মৃত্যু বরণ ক'রে নেব আমরা।

শেষ-নিদ্রা যখন আসবে, তখন ঘুমিয়ে প'ড়ব সেই পথের ধূলি চুম্বন ক'রে, যে-পথ বেয়ে আমাদের বাহিনী পৌঁছবে দিল্লীর কেল্লায়! দিল্লীর পথই স্বাধীনতার পথ—"চলো দিল্লী!"

এই অগ্নিময়ী বাণী শুনবার পরই অর্দ্ধ-লক্ষ ভারতীয় সৈনিকের কণ্ঠ হ'তে বেরিয়ে এল বজ্রগর্ভ সমর-সঙ্গীত—

"অব্ দিল্লী চলো, দিল্লী চলো, দিল্লী চলেংগে।"

১৯৪৪ সালের ১৮ই মার্চ ভারতীয় জাতীয় বাহিনী ব্রহ্ম-সীমান্ত পেরিয়ে ভারতের মাটিতে পদার্পণ ক'রল। ভীষণ যুদ্ধে কোহিমা অধিকৃত হ'ল। সেখানে, ভারতের মাটিতে, স্বাধীন ভারতের বিজয় পতাকা সগৌরবে উড্ডীন হ'ল, শহীদ ভারতীয়গণের রক্তে রঞ্জিত রণক্ষেত্রে। আজ যে ভারত ছেড়ে ইংরেজ সৈনিকেরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন ক'রেছে, সে শুধু কোহিমা-রণক্ষেত্রের স্মৃতি তারা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিতে পারেনি ব'লে! ভারতবাসী অস্ত্র ধ'রতে জানে, এই পরিচয় লাভ ক'রেই ইংরেজের ভারত-শাসনের স্পর্দ্ধা কর্পূরের মত উবে গেছে।

কোহিমা জয়ের পরে মণিপুরের রাজধানী ইম্ফল বেষ্টন ক'রেছিল ভারতীয় বাহিনী, কিন্তু রসদ এল না। জাপানীরা

রসদ পৌঁছে দেবে কথা ছিল, তা তারা দিতে পারল না, বা দিল না। হয়ত প্রতিকূল অবস্থার চাপে তারা সত্যই এতে অপারগ হ'য়েছিল, হয়ত বা ভারতীয়দের সাফল্য দেখে ঈর্ষান্বিত হ'য়েই তারা সাহায্য করতে অনিচ্ছুক হ'য়েছিল। যে-ভাবেই হোক—রসদ এল না, ক্ষুৎপীড়িত বাহিনী অগত্যা পশ্চাদপসরণ ক'রতে বাধ্য হ'ল। ক্রমে তারা রেঙ্গুনে ফিরে এল। সুভাষচন্দ্র অভিযাত্রীদের জনে জনে সুখ্যাতি ক'রে তারপর বললেন—"স্বাধীনতা-যুদ্ধের প্রথম পর্য্যায়ে আমরা হ'টেছি, কিন্তু আবার যুদ্ধ হবে। সেবার আমরা হ'টব না।"

দেখতে দেখতে যুদ্ধের চাকা ঘুরে গেল। এ্যাটম বোমায় জাপানের হিরোশিমা বন্দর ধ্বংস হ'য়ে গেল। ভীত জাপ-সরকার বিনা সর্ত্তে পরাজয় মেনে নিল। এ অবস্থায় একক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া আজাদ হিন্দ বাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয় উপলব্ধি ক'রে নেতাজী রেঙ্গুন থেকে সমস্ত সৈন্য সরিয়ে নিলেন। কেবল রেঙ্গুনবাসীর ধনপ্রাণ রক্ষার জন্য পাঁচ হাজার ভারতীয় সৈন্য রেখে গেলেন রেঙ্গুনে। এই সৈন্যদল না থাকলে অরাজক রাজ্যে সেদিন একটি ভারতবাসীও বেঁচে থাকত না—বর্মী-দস্যুদের হাতে।

টোকিও থেকে জরুরী পরামর্শের জন্য আহ্বান এল নেতাজীর কাছে। তিনি বিমানপোতে সিঙ্গাপুর থেকে যাত্রা করলেন ১০ই আগষ্ট তারিখে। ১৮ই আগষ্ট বেলা ২ ঘটিকার সময়

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

তাইহোকু বিমান-ঘাঁটির নিকটেই তাঁর বিমানখানি আকস্মিকভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। সঙ্গে সঙ্গে রটনা হয় তাঁর মৃত্যুসংবাদ।

এই দ্বিতীয়বার তাঁর মৃত্যু রটনা হ'ল। প্রথমবারের মত এবারকার রটনাও কালক্রমে মিথ্যা প্রমাণ হবে, এই আশায় এখনও বুক বেঁধে আছে ভারতবাসী! ভারতের অপরাজিত নরকেশরী নেতাজী সুভাষ অকালে চিরতরে অন্তর্দ্ধান ক'রেছেন, এ কল্পনা ক'রতেও ব্যথায় বুক বিদীর্ণ হয়ে যায়! আমরা বিশ্বাস করব না যে নেতাজী বেঁচে নেই! শতং জীবতু নেতাজী!

শেষ

শরৎ-সাহিত্য-ভবন প্রকাশিত

অভিরাম-সিরিজ

বকুল-পরী—হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ	১৲

অমরপ্রতিভা-সিরিজ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—সুধীন্দ্রনাথ রাহা	৸০
স্বামী বিবেকানন্দ— ঐ	৸০
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঐ	৸০
আচার্য্য জগদীশচন্দ্র— ঐ	৸০
আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র— ঐ	৸০
সাহিত্যাচার্য্য শরৎচন্দ্র— ঐ	৸০
নেতাজী সুভাষচন্দ্র ঐ	৸০
শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ঐ	৸০
স্যার আশুতোষ ঐ	৸০
নবাব সিরাজদ্দৌলা— ঐ	৸০
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন— ঐ	৸০
কর্ম্মদেবী— সূর্য্য পাল	৸০

অরুণোদয়-সিরিজ

বিহঙ্গিনী—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২৲
ভোরের ভৈরবী—হাসিরাশি দেবী	২৲
পায়ে চলার পথ—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	২৲
চির বাঞ্ছিতা—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	২৲
ফুটন্ত ফুল—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২৲
যুগের হাওয়া—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	২৲
পিপাসা—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২৲
বিপ্লবীর স্বপ্ন—প্রভাবতী দেবী সরস্বতী	২৲
পরবাসী—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	২৲

অলকনন্দা-সিরিজ

অনুবাদ-সিরিজ

মানুষের গড়া দৈত্য—হেমেন্দ্রকুমার রায় ১৲
স্বর্ণ-নদী—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ১৲
রুশ-গেরিলার কাহিনী—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৲
নাইনটী-থ্রী—সুধীন্দ্রনাথ রাহা ১৲
ছোট্ট পমির অভিযান—হেমেন্দ্রকুমার রায় ১৲
বড়দিনের বন্দনা—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ১৲
কেনিলওয়ার্থ—সুমথনাথ ঘোষ ১৲
থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ১ম খণ্ড—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৲
কাউণ্ট অফ মন্টিক্রিষ্টো—সুধীন্দ্রনাথ রাহা ১৲
রাজা আর্থার ও রথী—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ১৲
আইভ্যানহো—সুমথনাথ ঘোষ ১৲
থ্রী মাস্কেটিয়ার্স ২য় খণ্ড—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ১৲
বিদ্যালয়ে বাদল—সুধীন্দ্রনাথ রাহা ১৲
আজবদেশ লাপুটা—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ১৲
ট্যালিসম্যান—সুধীন্দ্রনাথ রাহা ১৲
যে মানুষ সব কর্ত্তে পারে—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় ১৲

অন্তঃপুরিকা-সিরিজ

ঘর সংসার—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়

অবিনশ্বর-সিরিজ

মধুছত্র—হেমেন্দ্রকুমার রায় ২৲
আমার দেশ—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ২৲
সোণার ভারত—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ২৲

অভিনয়-সিরিজ

প্রথম পুরস্কার—অখিলচন্দ্র নিয়োগী	৸০
মাতৃপূজা—সুধীন্দ্রনাথ রাহা	৸০
সিংহাসন—শচীন সেনগুপ্ত	৸০
বিদ্যাসাগর— সুধীন্দ্রনাথ রাহা	৸০
বিবেকানন্দ— ঐ	৸০
ছত্রপতি শিবাজী— ঐ	৸০
রাণা প্রতাপ— ঐ	৸০
প্রতাপাদিত্য— ঐ	৸০
সিপাহী বিদ্রোহ— ঐ	৸০
কালো আংটীর পল্টন— ঐ	৸০
রণজিৎ সিংহ— ঐ	৸০
* মীরাবাঈ— ঐ	৸০
* ভবানীর মঠ— ঐ	৸০
বর্গী ও বাঙ্গালী— ঐ	৸০
রবীন্দ্রনাথ— ঐ	৸০
কেদার রায়— ঐ	৸০
সীতা—সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়	৸০

* পুরুষ-ভূমিকা বর্জ্জিত